

















# প্রাচীন চিত্র



কটাসপাড়া, নৈহাটী।

প্রকাশক—

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ম্যানেজার—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী।

৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট।

কোহিনুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ১১১৮এ বাণিকতলা ষ্ট্রিট,

কলিকাতা।

ঐনুন্নিহপ্রসাদ বহু দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য—১০০ পূজা।

## গ্রন্থকার প্রণীত অন্য পুস্তক । .

অবকাশ ( গদ্য পুস্তক )	...	১০
মালঞ্চ ( পদ্য কাব্য )	...	১০
বঙ্কিম চিত্র ( যন্ত্রস্থ )	...	১১
গ্রন্থকারের ভ্রাতা শ্রীরামরমেন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত আশীর্বাদ ( সামাজিক নাটক )	...	১০

কাঁটালপাড়া বঙ্কিম চতুঙ্গাঠী, পোঃ নৈহাটী ঠিকানায় প্রাপ্তব্য ।

# উপহার ।

সদৃশরাশি—

শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র রায়

পাণি-পদ্মবে ।

লাবণ্য জলের লীলা—

শতছন্দে জীড়ানীলা,

অমরাগে “রক্তজবা”, “কুল” শুচিতার ।

লাজে “যুঁই”, ধৈর্য্যে “ধরা”, রূপে “পদ্ম”—মধুভরা,

পবিত্র “অপরাজিতা” স্বামীর সেবার ।

নাহি হেরি সে রমণী—

প্রকৃতির স্পর্শমণি,

মানবের শুভদাত্রী—সিদ্ধি সাধনার ।

গৃহের “আনন্দময়ী”,—

মহিমার “বিশ্বজয়ী”,

কীণ ছায়া জেগে আছে কবির কথার !

( ২ )

প্রায় সব “ছিন্নমস্তা”

অবিদ্যাব্যসনে ত্রস্তা,

নিজ হস্তে মাথা কাটি নিজ রক্ত খায় !

জীবধাতী কালকূট

মাথামাখি ওঠপুট,

কঠে স্থধা শুকায়েছে মস্ত—পিপাসার !

কিণ্ট আলিঙ্গন দিবে—

দীপ্ত ভেজে চমকিয়ে—

ছোটো নীরদের বৃকে চপলার প্রায় !

আসক্তিতে জ’লে’ জ’লে’—

উগ্মাদিনী পড়ে ট’লে’,

জলত্রে ময়ূচিকা ইজিতে দেখায় !

এ দেশ—প্রেমের ভূমি— আদর্শ প্রেমিঃ য—  
মৃতপত্নী পুণ্যস্মৃতি রেখেছ হিয়ার।

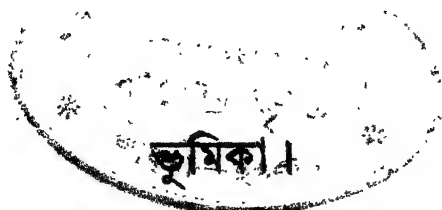
নূতন প্রণয় আশে, নূতন সংসার-পাশে—  
হও নাই বিজড়িত তুচ্ছ কামনার।

অভীভূতের গর্বে 'তুলি'— কীণ করে দীন 'তুলি'  
আমি বে ল'য়েছি 'তুলি'—হীন প্রতিভার,

কোথা রঙ ? শুধু কালি— রেখা-পাতে অঁকে' খালি—  
আজি সে "প্রাচীন চিত্র" দিলান্ন তোমার ॥

শুণমুখ—

প্রাণকান্ন ।



ভূগোলের সম্পূর্ণ অপরিচিত স্মৃতি সত্যতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, কোন কুদ্রাদপি কুদ্র—অণোরণীয়ান্ পল্লীগ্রামে—একজন শ্রোট পুরুষ বাস করিতেন। তিনি হাটে মাঠে কোথাও ঘাইতেন না, বারোয়ারী দলাদলিতে যোগ দিতেন না, সমাজে কুটুম্বিতায় কাহারও সহিত মিশিতেন না; বহির্জগতের কাছে তাঁহার বড় একটা পরিচয় ছিল না। কূটস্থ চৈতন্তের মত তিনি—একাকী বৈঠকখানার রুদ্ধতার কোটরে—খানমন হইয়া বসিয়া থাকিতেন। গ্রামের বিহগ-নখাকিত ধূলিময় বিরল পাত্ৰপথে দৈবাৎ চলিবার সময়, প্রতিবেশীরা তাঁহার অধর-চুষিত গড়গড়ার শব্দ শুনিয়া মাহুবেস অস্তিত্ব বুদ্ধিতে পারিত। তাঁহার সম্মুখে গিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া সেই চিরমৌন-মধুর অপূর্ব সমাধি ভঙ্গ করিবার কাহারও কখনও ইচ্ছা হইত না। দেশের চ'ক্ষে তিনি এমনি অবজ্ঞের হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কেবল নারী সমাজে—এই নিথর নির্ঝাঁকু জড়ভরতের একটু আদর ছিল। সকলেই শুনিয়া থাকিবেন—স্মৃতি শাস্ত্রের অনুশাসনে—বঙ্গের রমণীবৃন্দ সহস্রে কখনও কুয়াণ্ড ছেদন করেন না। এই কার্য সম্পাদনের জন্ত গৃহলক্ষ্মীরা পুরুষেরই সাহায্য লইয়া থাকেন। ঘেরে-মাহুৰ কুমড়া কাটিলে তাহার নাকি পুত্র-নাশে ভবিষ্যতি! এদিকে অন্নচিন্তার সমস্ত সমাধানের জন্ত, বাটীর পুরুষ অভিভাবককে প্রায়ই বাহিরে থাকিতে হয়। কাজেই কুমড়া কাটিবার আবশ্যক হইলে বাটীর গৃহিণী এই নিষ্কর্মা

---

ভূমিকা—লেখকের আধীন সভ্যত্বের জন্ত এইকারকে কেহ খেন দায়ী না করেন।

প্রকাশক।



পুরুষটিকেই ডাকিয়া লইয়া বাইতেন। তিনিও মেয়ে-মামুদের অসুস্থরোধ অবহেলা করিতে পারিতেন না। বরং পল্লীবাসিনীদের কুমড়া কাটিয়া দিয়া আপনার মধ্যে আপনি বিপুল আশ্রয় অহুভব করিতেন, সে আনন্দে তাঁহার চাপল্যহীন তরু হৃদয়ের সকল শূন্যতা ভরিয়া উঠিত; তিনি যে কখনও কাহারও কাজে লাগিতে পারেন—তাহা তিনি একেবারেই জানিতেন না, সুতরাং তাঁহার দেহ ধাবণের যে একটা প্রয়োজন আছে, এটুকু জানিয়া, রমণী-সমাজের নিকট তিনি আপনাকে চিরকৃতজ্ঞতাবিতে বিধা বোধ করিতেন না। বাঁহার কুমড়া কাটিবার দরকার হইত, সে অকুণ্ঠ-চিত্তে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া বাইত। তিনিও কুমড়া কাটিয়া দিয়া পরোপকারের আশ্রয়প্রসাদ অহুভব করিতেন।

এইরূপে—সেই পল্লীগ্রামের কুল-লক্ষ্মীদের কাছে—তিনি কুমড়া-কাটা বট্টাকুর নামে বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সাহিত্য-সংসারে আমি এখন সেই “কুমড়া-কাটা বট্টাকুর”। আমার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, খ্যাতি নাই, অর্থ নাই, শক্তি নাই, সাধনাও নাই, আছে কেবল শীর্ণ দেহে জীর্ণ প্রাণ, আর সেই প্রাণের পৰ্ব্বকূটারের মৃন্ময়ী বেদীর উপর চিন্ময়ী মা’র জন্ত ভক্তির কুশাসন পাতা। আমার দর্প দত্ত স্নায়া—আমি আটশব বঙ্গ ভারতীর সেবা করিয়া আসিতেছি। মাতৃভাবার সেবা—আমার নিত্য কর্তব্য পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ। তাই নেহাৎ অমাসুখ হইলেও সাহিত্যের মন্দিরে—কুমড়া কাটিবার জন্ত আমার ডাক পড়ে। আমিও গ্রহের ভূমিকা লিখিয়া পুরুষের অতিমান চরিতার্থ করি। এইরূপে—আমার ইহপরকালের কাৰ এক সময়েই হইয়া যায়।

কিন্তু আজ আমি বাঁহার আহ্বানে—কুমড়া কাটিতে বসিয়াছি—তিনি বলরাণীর একজন প্রসিদ্ধ পুজারি। আমার মত বেচ্ছাসেবক নহেন। তাঁহার এই “প্রাচীন চিত্রণ” পুরাতন প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি

নহে। পণ্ডিত শ্রীযুত রাম সহায় বেদান্তশাস্ত্রী—বাকালী পাঠকের কাছে—  
 সুপরিচিত। তাঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ ইতঃপূর্বেই বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা  
 লাভ করিয়াছে। এই “প্রাচীন-চিত্রের” আলোচ্যগুলি—“মানসী ও  
 মন্দ্রবানী” “নব্যভারত” “অর্চনা” “সাহিত্য-সংহিতা” “শাখতী”  
 ও “ব্রাহ্মণ সমাজ” পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ‘সাহিত্য-  
 পন্নিবৎ’, ‘সাহিত্যসভা’, ‘সাহিত্যসম্মিলন’, ‘বারাণসী সাহিত্যপন্নিবৎ’ এবং  
 ‘বঙ্কিমসাহিত্য-সম্মিলনী’ প্রভৃতি বিবিধ সম্মেলন-প্রতিষ্ঠানে—পঠিত  
 হইয়া সহস্র কৌতূহলী শ্রোতাকে আনন্দ দান করিয়াছিল। সেই গুলিই  
 আজ সম্প্রতি গ্রন্থাকারে পাঠকের সঙ্গে পুনঃ-সম্ভাষণ করিতে অগ্রসর।  
 সুতরাং ‘প্রাচীন চিত্রের’ পরিচয় দিতে যাওয়া আমার পক্ষে লগ্নন  
 জালিয়া চাঁদ দেখানো। জানিয়া শুনিয়া সে বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত হইবার  
 প্রয়োজন কি? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি—“কাঁটালপাড়ার” উর্বরা  
 ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া যে প্রতিভা “অবকাশে” অক্লুরিত হইয়াছিল, বর্তমান  
 গ্রন্থে তাহাই ফলে ফুলে শোভিত বিরাট বনস্পতির আকার ধারণ  
 করিয়াছে। আমি বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়কে বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই  
 বলিয়া জানিতাম, অথচ নীরস মায়াবাদের ভিতর হইতে তিনি যে  
 কাব্যরসের মধু আহরণ করিয়াছেন, তাহা যেমন স্বচ্ছ তেমনি স্বাস্থ্যকর।  
 কবির সুন্দর দৃষ্টি লইয়া, দার্শনিকের বিশ্লেষণী শক্তির সাহায্যে র্যাকেলের  
 অপরাভেয় তুলিতে—শৃঙ্খলানিপুণ পাকা হাতে তিনি ওই “প্রাচীন  
 চিত্র” বাকালীর ‘ক্যানভাস-ফলকে’ অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রাচীন  
 কাব্যসুন্দরীগণের মুহূ-কথা, চাপাহাসি, গোপন-কটাক্ষ, চরণধ্বনি,  
 এমন কি বাসনাবিহ্ন স্বার্থ বোবনের লালসাতুকু পর্য্যন্ত—তাঁহার কাছে  
 ধরা পড়িয়াছে। তিনি যেন কালিদাস, ভবভূতি ও বাণভট্টের প্রত্যেক  
 বাক্যের উপর পাহারা দিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ‘ওত’ পাতিয়া বসিয়াছিলেন।  
 তাঁহার চিন্তা-প্রবণতা ও রসাত্ত্ববাক্যতা সত্যই অভিনব। বেদান্তশাস্ত্রী

মহাশয়ের অপূর্ণ লিপি-কোশলে—চির পুরাতন নারিকায়ণ নবরাগে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ—সমালোচনার তুলনামূলক নারী-চরিত্রের পরিমাণ করিতে গিয়া তিনি বেক্স জটিল হৃকোথ্য গুরুতর সমস্যার সহজ মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা অস্বস্তিজনক; অন্ততঃ আমি কোথাও পড়ি নাই। “প্রাচীন চিত্রের” লেখক, সাগর ছেচিয়া, মানিক তুলিয়া—তাহারই রক্তরাগ-দীপ্তির উজ্জ্বল ‘রোশ্‌নি’তে বীণাপাণির যে আরতি করিয়াছেন, আমাদের মাতৃভাবের মঙ্গলের জন্য তাহাই স্তম্ভ স্বভাব। অতীতের লুপ্ত প্রায় স্মৃতি তাহার কথার আমাদের মনে পড়িয়া গিয়াছে। আমি জোর গলায় বলিতে পারি—বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়—একজন ভাব-বিভোর বৈজ্ঞানিক; হৃদয়-তত্ত্বের অভিজ্ঞতার তিনি বৈদিকের মত সমদর্শী, তান্ত্রিকের মত সৃষ্টি-কুশলী, আচার্য্যের মত রহস্যবিদ এবং বৌদ্ধের মত বিশ্ব-প্রেমিক।

আমরা তখন পাঠশালার পড়ি। কদমতলার আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের ভবনে—দুই বেলা সাহিত্যের দরবার বসে। আমরা অনেক বালক খেলা করিতে করিতে দরবারে সাহিত্যরথীদের মস্তব্য শুনিয়া ধস্ত হই। সেই সময় একদিন একখানি সর্বগ্রাসী সংবাদপত্রে সাহিত্যসেবী কথটা পড়িয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—সাহিত্যসেবী মানে কি? অক্ষয়চন্দ্র হাসিতে হাসিতে আমার বলিয়াছিলেন—“তুমি বল দেখি, অহিকেন-সেবী মানে কি?” চুঁচুড়ার খেকশিরালী—তখন অহিকেনের লীলাক্ষেত্র, আমি অহিকেনের অর্থ জানিতাম। তৎক্ষণাৎ আচার্য্যের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম—যে আকিং খায়, তাহাকে অহিকেন-সেবী বলে। আমার সুখের দিকে চাহিয়া আচার্য্য বলিয়াছিলেন,—“তাহা হইলে—সাহিত্য সেবী মানে যে, সাহিত্যের মাথা খায়।” অবশ্য আচার্য্য কথটা রঙ্গ করিয়াই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি—মহাপুরুষের সুখের মহাবাক্য কোমল কোমল হইলেও অধুনা কঠোর সত্যে পরিণত হইয়াছে। আজ

কাল বাঁহারা সাহিত্যের মাথা খাইতেছেন, তাঁহারা 'সাহিত্য-সেবী' আখ্যা পাইতেছেন। এই সকল ধুরন্ধরদের লৌহ-লেখনী—প্রভাস তাঁর কুল-নাশন মুদ্রা! হিন্দুস্তানের বিরাট বহুবংশ ধ্বংস না করিয়া সে মূল ফল হঠবে না। জানি না, জীবন রংধন-সারথি নারায়ণের মনে কি আছে। আজকালের অসার 'ছাইড' ছাইকলজির দোহাই দিয়া সত্যকে কুসংসার বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। সাহিত্যের এই দুঃখ-দুর্গতির দিনে—বঙ্কিম-প্রতিবাসী "বঙ্কিম চতুষ্পাটীর" অধ্যাপক বঙ্কিমসাহিত্য সম্মিলনীর সম্পাদক—বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় যে পুরাতন ভাবধারা বজায় রাখিয়াছেন,—বাস্তবিক এটুকু আমাদের গর্বের কথা। তাঁহার সাহিত্য-সেবা সকল হইয়াছে। তিনি আদর্শ সাহিত্য-সেবী, তাঁহার ভাষা স্বর্গ-বীণার স্তায় অকারময়। সাহিত্যের শ্রীভ্রষ্ট স্থানে—বেথানে নিশাচেরা করতালি দিতেছে, প্রতিদ্বন্দ্বী অট্ট হাসিতেছে, শৃঙ্গালের সমবেত কণ্ঠে অশ্রাব্য 'কোরাস' ছুটিতেছে, সেখানে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ রামমহারের আশীর্ব্বতিলিত অস্তর হস্তই আমাদের তরসা। প্রাচীন চিত্রের অলোক-সামান্ত বর্ণচ্ছটার আমি—অকণ-কিরণে শুভদিনের সূচনা দেখিতে পাইরাছি। এই ক্ষুদ্র ভূমিকা সেই কৃতজ্ঞতারই কৈফিয়ৎ, মোসাহেবের স্মৃতি-স্তব্ধ বাক্যবতা নহে।

চুহুড়া  
১৯১৩২

}

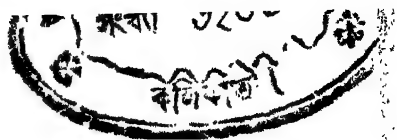
শ্রী ব্রজবল্লভ দাস ।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অনুদ	তদ
৫	৩	শকুন্তলা সহ	শকুন্তলাসহ
৯	২০	চল	চল
১১	১৪	হুতন	নুতন
১১	১৭		
১৩	১৭	শকুন্তলা	শকুন্তলা
১৭	৬	তপোবনে-	তপোবনে—
১৭	৪	অনশ্রু	অনশ্রু
১৮	৬	যে	যে
১৮	২	শকুন্তলা	শকুন্তলা
১৯	২	তপস্বি কত্তাগণের	তপস্বিকত্তাগণের
১৯	২২	প্রস্থানোদ্যোগ	প্রস্থানোদ্যোগ
২১	৪	বলিল	বলিল—
২১	১২	শকুন্তলার প্রেম গীতিকা	শকুন্তলার প্রেম- গীতিকা
২২	৪	জাতীর	জাতের
২৫	২	একাপ্রাণ	একপ্রাণ
২৮	৯	শরীর লাভণ্য।”	শরীরলাভণ্য”
২৮	১৮	বাহু দুটি	বাহুদুটি
৩২	১০	চক্ষু কোণলয়	চক্ষুকোণলয়
৪২	১৫	কটাক-কানধরী	কটাক কানধরী
৪৭	১৭	মহাশ্বেতা-প্রিয়দেহ	মহাশ্বেতা প্রিয়দেহ

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অনুব	তদ
৪৮	১	অতশা	আতশা
৫০	২১	কিছু	
৫২	১৪	সে	কবি
৫৩	৭	এই	অটাবক্র
৫৯	১৬	জন্তক	জন্তক
৬০	১১	আসি	আদি
৭৩	১৭	ব্রাহ্মণ শিঙা	ব্রাহ্মণশিঙাঃ
৭৫	১৪	বিস্মৃতকণা	বিস্মৃতকণ
৮৬	১০	মূর্ছা দর্শনে	মূর্ছাদর্শনে
৯২	৬	বদ্ধস্বরা	বদ্ধস্বরা
৯৫	২০	অনুতাপের ও	অনুতাপেরও
৯৬	১০	বদ্ধ	বদ্ধ
১০৫	১৮	মুখের মত	মুখত্রীর মত
১০৬	২৩	এবং	—এবং
১১১	২৩	দর্পনিকবঃ	দর্পনিকবঃ
১১৫	১০	হুমত	হুমত
১২৩	২৩	গর্ভগ্রাহি ও	গর্ভগ্রাহিও

---





# প্রাচীন চিত্র



## প্রথম খণ্ড

### অনসূয়া ও প্রিয়ব্রত

অনসূয়া ও প্রিয়ব্রত লইয়াই শকুন্তলা। তপোবনবাসিনী শকুন্তলার স্বভাবসরল কোমল ভাবই অনসূয়া। তপস্বিনীশিষ্য শকুন্তলার আহার্য-শোভাময় উজ্জলভাবই প্রিয়ব্রত। অনসূয়া-ভাবে শকুন্তলা হাব-ভাব-বজ্রিতা, আশ্রমবাসিনী কিশোরী। প্রিয়ব্রত-ভাবে শকুন্তলা হাবভাবময়ী, বিলাস-বিভ্রমবতী তরুণী। শকুন্তলা বর্তমানে যেন অনসূয়া; ভবিষ্যতে যেন প্রিয়ব্রত। চিং-শক্তি ও অচিংশক্তি না বুঝিলে যেমন মহাশক্তিকে বুঝা যায় না; তদ্রূপ অনসূয়া ও প্রিয়ব্রত-ভাব না বিশ্লেষণ করিলে শকুন্তলা চরিত্রটিও বোঝা যায় না। শকুন্তলার প্রস্থানের পর অনসূয়া ও প্রিয়ব্রতের কথা কবি কিছু বলেন নাই বলিয়া যে ইহারা কবির উপেক্ষিতা, আমরা এমন কথা বলি না। কেন, তাহা পরেই পরিস্ফুট হইবে।

কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুন্তল” নাটকে শকুন্তলা মূল নায়িকা। অনসূয়া ও প্রিয়ব্রত উপনায়িকা মাত্র। অনসূয়ার মধ্যে যুগ্ম নায়িকার ভাব। সে স্বভাবত সরলা, কোমল-প্রকৃতি অথচ মুহূ-লজ্জাশীলা; প্রীতির বিকচ-



কুসুম। পূর্ণচন্দ্র-প্রভা মূর্তি ধরিয়া যেন ধরাতেলে অবতীর্ণা; নবফুট  
মল্লিকার মতই পরিমলময়ী। অমৃতাশূভ্রা তাই, অনমৃতা। জীর্ণা, ঘেব,  
হিংসা, গুণেও দোষারোপ, কাপটা, ছলনা ও কোটিল্য এখানে  
অমৃতাওই মধ্যে।

প্রিয়স্বদার মধ্যে মধ্যা নায়িকার ভাব। ‘প্রকটস্বরযৌবনা’ ‘প্রগল্ভ  
বচনা’ ‘মধ্যম ব্রীড়িতা’ “মধ্যা”। স্বভাবত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, অতিচতুরা; রসের  
অধিদেবতা। নবোদিত সূর্য্যারশ্মি যেন শরীরিণী হইয়া সঞ্চরমানা। পূর্ণ  
প্রফুল্লিত পদ্মিনীর মতই সৌরভময়ী; প্রিয়বাদিনী বলিয়াই প্রিয়স্বদা।  
রসময়ী বাণী প্রণয়ী প্রণয়িনীর কর্ণে মধু বর্ষণ করে। মানসিক অবস্থাভেদে  
কখন অনমৃতার উপযোগিতা, কখন বা প্রিয়স্বদার উপযোগিতা। কানন-  
রাজীর নিক্ত শ্রাম দিক্টিও যেমন মধুরদর্শন, পক্ষীকুল-মুখরিত দিক্টিও  
তদ্রূপ ক্রতিমুভগ। সংসারে ছুই-ই আবশ্যক।

## অনসূয়া।

অনসূয়া আশ্রমের শাস্তিময়ী লক্ষ্মী। প্রিয়স্বদা নগরের ভোগময়ী সম্রাজ্ঞী।  
একটি তরুচ্ছায়া-মিথুনা বন-নদী ধীরে ধীরে নীরবে বহিয়া যায়। অতী  
বর্ষার রক্তভঙ্গে নৃত্যশীলা গিরিনদী সবেগে সগর্বে ছুটিয়া চলে। একটি  
জ্যোৎস্না মধুরা শারদীয়া রজনী। অপরটি আলোক-দীপ্তা প্রভাতছবি।  
একটি ভাবপ্রধানা কন্ঠময়ী বালা। দ্বিতীয়টি কন্ঠপ্রধানা ভাবময়ী  
রমণী।

অনসূয়ার সৌন্দর্য্য বড় কোমল, “ব্রীড়াসমুচিত,”—তাহাতে বাধুর্ঘ্য  
আছে কিছু লাহ নাই। সে সৌন্দর্য্যে মানব মুগ্ধ হয়, কিন্তু পুড়িয়া মরে  
না। মেহে যৌবনের শ্রাম সুবধা কিন্তু মুখখানি বালিকার মত। যেমন

## অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা

নির্মল, তেমনই সরল, চাতুর্ঘ্যশূন্য। অনসূয়ার প্রীতি বালচন্দ্র-জ্যোতির মত  
স্বমধুর ও সুশীতল। সে প্রীতি হৃদয়ের বিশ্রাম। তাহাতে খেলার সাধ  
মেটে কিন্তু তাহা জীবনসংগ্রামে সহায়রূপা হয় না ; অবসন্ন হৃদয়ে উদ্দীপনা  
আনে না। তাহা স্বপ্নের মত, আবেশের মত। যেন এ কঠিন পৃথিবীর  
নহে। সে কৃষ্ণতার স্থির চক্ষুতে বিদ্যাদাম-ক্ষুরগচকিত কটাক্ষ খেলে  
না। তাহা তপোবনশ্রীর মতই প্রশান্ত, মন্ত্রপূত বারির মতই পবিত্র।  
সঞ্চারিণী পল্লবিণী লতার মত তাহার গতি, কিন্তু তাহা হেলিয়া হুলিয়া চলে  
না। গজগতির সহিত তাহার তুলনা হয় না। বস্ত্রত কোমল মকমলের  
আস্তরণেই তাহা শোভা পায়। তাহার রক্তিম অধরে স্বচ্ছ হাসিটি চন্দ্রকর-  
রশ্মির মত সংমুচ্ছিত, বড়ই মিষ্ট, বড়ই কোমল। সে হাসির মধ্যে, বুবত্তীর  
লালসা নাই, চতুরার কুটিলতা নাই, বিলাসিনীর ছলাকলা নাই।  
তাহা অমৃতের মত পবিত্র, শিশুর মত নিকলক, মুক্তাকলের মত লাবণ্যময়।  
অনসূয়া কথা কহে, যেন বীণা ঝঙ্কার দেয়। তাহাতে সরলতা ও মাধুর্য  
যেন উচ্ছলিত হয়। সে যেন 'প্রমোদসানে বিশ্রান্তির' মত, যুদ্ধ শেষে  
শান্তির মত।

## প্রিয়ম্বদা।

প্রিয়ম্বদার সৌন্দর্য্য পূর্ণপ্রস্ফুট, তরলান্দোলিত শতদলের মত। তাহাভে  
সুवासও আছে, মত্ততাও আছে। সে সৌন্দর্যালোকে মানব মুগ্ধও হয়,  
আবার দগ্ধও হয়। প্রিয়ম্বদার হৃদয়ে গোলাপের সৌরভ, যুধিকার  
কোমলতা, পল্লবৃক্ষের কর্কশতাও বিস্তারিত। যেমন সে রস-ভাবজ্ঞা, ব্যঙ্গ-  
পরায়ণা, তেমনই মধুর-হাসিনী, প্রিয়বাদিনী। সে যেমন প্রেমগীতির  
মত মনোহারিণী, তেমনই ভেরীধ্বনির মত উদ্দীপনাকারিণী। তাহার  
প্রাণটি নদীর স্রোতের মত বাহ্যত চঞ্চল, বৃত্ততঃ কথঞ্চিৎ আবিলভাময় ;

কিন্তু অভ্যন্তরভাগ যেমন শীতল, তেমনই স্বচ্ছ। তাহার দ্বারা ভালবাসার সাধ মেটে, খেলার সুখ চলে, আবার লালসা-ক্ষুধারও শান্তি হয়। শ্রান্ত হৃদয়েরও বিশ্রাম, জীবনযুদ্ধেও সহায়রূপা। একাধারে জাগরণ ও স্বপ্ন। তপোবনের পবিত্রতার সঙ্গে রাজাস্থপুরের রসভাব-চাতুর্যের মিলন প্রিয়ষদাকে এক অপূর্ব ত্রীসম্পৎ দান করিয়াছে। তাহার ভালবাসা মধুর অথচ উন্মাদক ; কোমল অথচ তীব্র। তাহার দৃষ্টি সরল অথচ অন্তর্ভেদিনী ; প্রেমে চলচল, বাঁধে জলজল সে দৃষ্টি “বিহাদম্মিপূর্ণ-মেঘবৎ চকল”। তাহার ভঙ্গীটি “নীলাময়ী,” সঙ্গীতমধুরা, সম্রাজীরই উপযুক্ত। হাসিটি জ্যোৎস্নাকর-দীপ্ত, সুন্দর ; দর্শনমাত্রই মন-প্রাণ হরণ করে। সে হাসির ভিতরে বাহিরে রসতরঙ্গ দিবারাত্রই বহে ; সুভাফলের মত অনবরতই ফুটে। তাহার বাণী রসময়ী, আনন্দময়ী ও প্রেমময়ী। বাহাতে পড়ে, তাহাই সরস হইয়া উঠে। প্রিয়ষদা হৃদয়ের বিশ্রাতি, অবসাদের উন্মাদনা, বীরত্বের উদ্দীপনা। স্বর্গের সুখ, চিত্তের ভোগ, ভালবাসার বিলাস।

### অনসূয়া ।

অনসূয়া প্রকৃতির ছহিতা, সারল্যের প্রতিমূর্তি। চাতুর্য জানে না, হাবভাব বিলাস বিভ্রম কিছুই শেখে নাই। কথার মধ্যে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণবাণ কিরূপে বোজনী করিতে হয়, তাহাতে সে অভ্যস্তা নচে। তাহার আঁগটি ছলাকলা-শূন্য, সহায়কৃতিময়, তাই শকুন্তলা যাহা কিছু মনের কথা নির্ভয়ে অসঙ্কোচে অনসূয়াকেই কহে ; ব্যঙ্গের বকল মোচন করিবার জন্য অনসূয়াকেই অহুরোধ জানায়।\* প্রিয়ষদার উপর কৃত্রিম রাগের ভাণ

---

\* সখি অনসূয়ে, বড় শক্ত করিয়া প্রিয়ষদা আমার বকে বকল আঁটিয়া দিয়াছে। তুমি শিখিল করিয়া যাও।

## অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা

করিয়া লজ্জাকোপ-জড়িত নেত্রে অনসূয়াকেই কহে “অনসূয়ে, আমি চলিলাম।”

আশ্রমের নূতন তরুণলিতে জল দিবার জন্য শকুন্তলা সহ অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা উপস্থিত। তিনজনের কক্ষে ক্ষুদ্র সেচন-কলস; অধরে মৃত্ত হাসি, ললাটে স্বচ্ছ স্বৈদবিন্দু। তিন জনের বয়স প্রায় সমানই। তন্মধ্যে অনসূয়া কিছু ছোট, প্রিয়ম্বদা সামান্য বড় মাত্র। প্রিয়ম্বদা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর মত, অভিন্নহৃদয়া সখীর মতই শকুন্তলাকে ভালবাসে। আর অনসূয়া মুগ্ধা কিশোরী, নববধূর মতই (ঠিক উপমান না হইলেও) শকুন্তলায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে। অনসূয়ার ভালবাসা কত গাঢ়, সহানুভূতি, কত গভীর, মনোভাবটি কত কোমল—তাহা তাহার প্রথম কথাটিতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

“সখি শকুন্তলে, পিতা কথন তোমার চেয়ে আশ্রমের তরুণলিকে অধিক ভালবাসেন; নতুবা নব মল্লিকার মত কোমলা তোমাকে আলবাল-পরিপূরণে নিযুক্ত করিবেন কেন?”

কি মধুর কোমল বাণী! বাণীর ভিতর দিয়া অনসূয়ার কোমল স্মৃতিপানি যেন সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শকুন্তলা যখন উত্তরে বলিল,—“সখি শুধু পিতার নিয়োগ বলিয়া নহে, ইহাদের উপর আমার সহোদরের রেহ আছে।” অনসূয়া সে কথার আর প্রতি-উত্তর করিল না; নিঃশব্দে জলসেচন করিতে লাগিল।

প্রিয়ম্বদা যখন জিজ্ঞাসা করিল—“অনসূয়ে, জান কি, শকুন্তলা কেন বনভোষিনীকে এত আগ্রহভরে দেখিতেছে?” অনসূয়া সরলপ্রাণা, অভ সে বুঝে না; প্রিয়ম্বদার বাক্‌চাতুরীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার সাধ্য কি? অস্বরূপ উত্তরও দিল—“আমি জানি না।”

স্বামী হৃদয়ের গভীর আকৃতি দেখিয়া, দ্বিধা মধুর রসালোপ করিয়া,

ঐশ্বর্য ও দাক্ষিণ্যের অপূর্ণ সম্মিলন লক্ষ্য করিয়া প্রিয়দর্শনার জানিতে ইচ্ছা হইল—“ইনি কে?” প্রিয়দর্শনা সে ইচ্ছাটি দমন করিল। অননুয়া কিন্তু সে কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া একেবারেই পরিচয় জানিতে চাহিল। সে জিজ্ঞাসার মধ্যে ঋষিকৃত্তাগণের সুসভ্যতা, শিষ্টাচার, সদালাপ এবং সুশিক্ষার প্রভাবই পরিস্ফুট।

“আর্যের মধুরালাপজনিত বিশ্বস্ততাই আমাকে আলাপে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। আর্য, কেন্‌ রাজর্ষিবংশ আপনার দ্বারা অলঙ্কৃত, কেন্‌ দেশ সম্প্রতি বিরহোৎকৃষ্ট, কি নির্মিতই বা এমন সুকুমার আত্মাকে আপনি তপোবনাগমন-শ্রমে উপনীত করিয়াছেন?” পরিচয় লইবার ভঙ্গীটি বস্তুতই বড় সুন্দর। ইহার মধ্যে কৃত্রিম আদবকারনা নাই, যুবতীজনোচিত ছলাকলা নাই। ইহা অকৃত্রিম হৃদয়ের স্বতোনিশ্চয়তা বাণী। কে বলিবে, প্রাচীনকালের রমণীরা শিক্ষাদীক্ষাহীন এবং শিষ্টাচার শূন্য ছিলেন?

রাজা শকুন্তলার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। বাঙনিপুণা রসিকা প্রিয়দর্শনা সে পরিচয় দিল না। সে পরিচয় দিবার কালে কি বাধা উপস্থিত হইবে, তাহা সে পূর্বেই বুঝিয়াছিল। এবারও অননুয়াই সে পরিচয় দিতে বলিল—

“রাজর্ষি বিশ্বামিত্রই সখীর জনক। তাত কথ প্রতিপালক পত্নী মাত্র। তপস্তারত বিশ্বামিত্র বসন্তোদয়-কালে অঙ্গরা মেনকার উদ্গাদক রূপ দেখিয়া”—এইরূপে অসঙ্কোচে শকুন্তলার জন্ম ব্যাপার বলিতে গিয়া নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক লজ্জার জন্ত অননুয়া আর বলিতে পারিল না, মধ্যপথেই থামিয়া পড়িল। এ লজ্জা স্বতাবলরলার পক্ষেও স্বাভাবিক। বরসের ধর্মে, সুশিক্ষার গুণে, শকুন্তলার মত ভাবপ্রবণা এবং প্রিয়দর্শনার মত রসভাবজ্ঞার সাহচর্যে তাহার স্বাভাবিক লজ্জাটুকু আরও বৃদ্ধি

## অনসূয়া ও প্রিয়দর্শনা

পাইয়াছে। শকুন্তলার মত সজ্জিনী পাইয়াছিল, প্রিয়দর্শনার মত সখী লাভ করিয়াছিল আর তপোবনের রমণীধর্ম-শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়াছিল বলিয়াই অনসূয়া “মিরন্না” হইয়া উঠে নাই। অনসূয়ার অবস্থায় কখন “মিরন্না” ফুটে না। তপোবন ত আর নির্জজন দ্বীপ বা জনশূন্য অরণ্যানী নহে যে, তথায় স্বভাবের বস্ত্র ভাবটি ফুটিতেই হইবে।

শকুন্তলা যখন অনসূয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“সখি অনসূয়ে, হুতন কুশস্থটিতে আমার চরণ ক্ষতবিক্ষত, কুরুবকতরু-শাখায় আমার বকল পরিলগ্ন হইয়াছে। অপেক্ষা কর, আমি ছাড়াইয়া লই।” অনসূয়া অমনই দাঁড়াইল; সে অতশত বুঝিল না। প্রিয়দর্শনা বোধ করি, তখন কিয়দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে; তাই তাহার মুখে এমন সময়ে কোন সরস রসিকতা ফুটিতে দেখিলাম না।

দ্রুমস্ত-বিরহে শকুন্তলা কাতরা; বেতসলতা-কুঞ্জের কুশ্মান্তরণে সে শয়ানা। শরীরের তাপ এত অসহ্য, মন এত তন্ময়—সখীরা যে বাতাস দিতেছে, তাহার উদ্বোধ পথান্ত নাই। শকুন্তলার অস্থিতার মূল কি, প্রিয়দর্শনা সম্পূর্ণই বুঝিয়াছিল। অনসূয়া একটা ক্ষীণ আশঙ্কা করিয়াছিল মাত্র। আর সে আশঙ্কা কান্নাবারও হেতু—অনসূয়ার শিক্ষা আর পারিপার্শ্বিক ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশ। দ্রুমস্ত-বিরহেই সখী আমাদের এই দুঃখময়ী অবস্থায় নিপতিতা হইয়াছে—প্রিয়দর্শনার মুখে এই কথা শুনিয়া তবে সে বুঝিতে পারিল।

অনসূয়া যদিও প্রকৃতির চুহিতা, স্বভাবসরলা, কিন্তু সে রীতিমত নারীধর্ম-শিক্ষায় শিক্ষিতা। ইতিহাস-কথাপ্রবন্ধে তাহার সম্যক্ অধিকার বর্তমান। ইহা তাহার মুখের কথাতেই প্রকাশ।

“সখি শকুন্তলে, তোমার মনোগত ভাবটি কি, তাহা সবিশেষ অবগত নহি। তবে ইতিহাস-কথাপ্রবন্ধে কামিগণের অবস্থা বাহ্য অবগত

হওয়া যায়, তাহাতে তোমার সেই অবস্থাই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বল সাথি, কি নিমিত্ত তোমার এ আশ্বাস? রোগ না জানিলে চিকিৎসা কি করিব?”

শকুন্তলা স্ব-মুখে রোগটি ব্যক্ত করিল, তাহার প্রশমনোপায়টিও বলিয়া দিল। প্রার্থনা জানাইল “তোমরা যাহা ভাল বোঝ, তাহাই কর। তবে আমি বাহাতে সেই রাজবির অল্পকম্পার পাত্রী হই, তাহা দেখিও। নহিলে আমি শুধু তোমাদের স্মৃতিপথেই রাইয়া বাইর।” প্রিয়বদাই তখন জনান্তিকে অননুহাকে কহিল “অননুহে, আকাশের চরমে উঠিয়াছে, আর কাল হরণ করা চলে না।” তখন শকুন্তলার হৃৎথে অননুহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; সেই কাতর প্রার্থনায় তার মনোপ্রার্থীতে একটি করুণ রাগিনী বাজিল। সে একেবারেই তাড়াতাড়ি বাগ্নশব্দে প্রিয়বদাকে ধরিয়া ধসিল—

“প্রিয়বদে, কি উপায় হইবে? কি উপায়ে বিরলে সত্তর সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা যায়?” সরলপ্রাণ অননুহাতে সংসারের কুটিলতা এবং পাপ এখনও স্পর্শ করে নাই। তাই তাহার সরল নিম্পাপ মনে কোনরূপ কুষ্ঠা, সন্দেহ দেখা দিল না, কোন প্রকার তর্কবিতর্ক উত্থিত হইল না। অননুহা শকুন্তলার নিশিরাই আছে। “তদুগতপ্রাণ: হি সা।”

প্রিয়বদা বুঝাইল—বিরলে—ইহাই চিন্তার বিষয়। সত্তর—ইহা ছকর নহে। ইহার অর্থও অননুহা বুঝিল না। প্রিয়বদা বুঝাইয়া দিলে তবে সে বুঝিল। রাজাও যখন প্রেমমত্তে মুগ্ধ; তখন সমাগম কিছু ছকর নহে। কিন্তু নির্জনে সমাগম—তাহাই ভাবনার বিষয়। কেবল যে স্থান নির্ঝাঁচনেরই কোশল করিতে হইবে, তাহা নহে। নির্জনে সাক্ষাৎ করান উচিত কি না, তাহার পরিণাম ফল কি—এই সকল ভাবনাই প্রিয়বদার মনে জাগিল। অননুহা ও সকল বুঝিয়া, অত ভাবিয়া কার্য্য করে না।

## অনসূয়া ও প্রিয়স্বদা

যখন যেটি বলা আবশ্যক বা করা প্রয়োজন, তাহাই তৎক্ষণাৎ সে বলে এবং করে। কথা চাপিয়া রাখিতে সে জানে না, চাহেও না। দেবসেবা-চ্ছলে পুস্পরাশির মধ্যে করিয়া পত্র পাঠাইবার কৌশল অনসূয়ার মাথায় আইসে নাই। তবে সে অসঙ্কোচে পত্রখানি দুয়ন্তের নিকট পৌছাইয়া দিতে প্রস্তুত।

রাজা দুয়ন্ত সেই বেতসলতা-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছেন। সখী শকুন্তলার চক্ষুতে ও অধরে শৃঙ্গার-লজ্জার লুকোচুরীও আরম্ভ হইয়াছে। রাজাদিগের তখনকার কালে বহু পত্নী থাকা নিয়ম ছিল। শকুন্তলা যাহাতে রাজার প্রণয়পাত্রী হইয়া প্রধানা মহিষী হয়—সেই আকাঙ্ক্ষা অনসূয়া ও প্রিয়স্বদা করিবেই। কিন্তু এখানেও অনসূয়াই মনের কথা খুলিয়া বলিল, একেবারেই রাজার নিকট অনুরোধ বল, আবদার বল, প্রার্থনা বল, করিয়া বলিল—

“সখী আমাদের যাহাতে বন্ধুগণের অনুশোচনার পাত্রী না হয়, তাহা দেখিবেন।”

দুয়ন্তশকুন্তলার প্রণয়লাপের মধ্যে আর থাকা উচিত নহে—ইহা অনসূয়ার মাথায় আইসে নাই। সময়াভিজ্ঞা, রসভাবচতুরা প্রিয়স্বদাই কৌশলে অনসূয়াকে লইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল।\*

## প্রিয়স্বদা।

প্রিয়স্বদা প্রকৃতির বধু। বধু-উচিত লজ্জা, গোপন ভালবাসা, প্রণয় লুকোচুরী, ভাবভাব বিলাস বিভ্রম—সর্ব বিধয়েই সে শিক্ষিতা। অব-

---

\* পাঠান্তরও আছে বটে—অনসূয়াই প্রথম বলে ‘চল যুগলিতকে উহার মায়ের নিকট রাখিয়া আসি।’ প্রিয়স্বদা উত্তরে কহে ‘তুমি একাকী পারিবে না, আমিও বাই’। এ পাঠান্তরটি অনসূয়া চরিত্রের উপযোগী নহে। অনসূয়া সরলভাবে বলিয়াছে, এইরূপে চরিত্রটি কবার রাখাও বেশ কষ্ট করনা হইয়া গুড়ে। লেখক।



শুভ্রনের অস্ত্রাঙ্গে তার ক্ষুরশচকিত কটাক খেলে। অঞ্চল-চাপা হাসির মধ্যে তার মনোভাবটি ফুটিয়া উঠে। শকুন্তলায় বাহা আছে, হস্তিনাপুর-রাজ্যে শকুন্তলায় বাহা দেখা দিবে—প্রিয়ঘদায় তাহাই পূর্ণভাবে দেদীপমান। রাজ্যান্তঃপুরের শাসনকর্ত্রীকে কতদূর চতুর্বা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইতে হইবে—তাহারই আভাস প্রিয়ঘদায় বিদ্যমান।

প্রিয়ঘদা যেমন স্বভাব-চতুরা, তেমনই সর্ববিষয়ে সুশিক্ষিতা। মর্ষপুটে রুদ্ধ ভালবাসার কণি প্রস্ফুটুকু সে দেখিতে পায়। নবপ্রণয়বতী মুগ্ধা-কিশোরীর আধঃপ্রেম, আধ লজ্জার লুকাচুরী সে সহজেই ধরিয়া ফেলে। সাত্বিক ভাব—হ্রস্ব হ্রস্ব কম্প, স্বেদজলস্রব, ভূমিপানে আনত দৃষ্টি এবং লীলাপত্র-চ্ছেদন তাহার চক্ষুতে অজ্ঞাত থাকে না।

শকুন্তলা যখন প্রিয়ঘদার দোষ দিয়া বক্ষের দৃঢ়বন্ধ বন্ধলটি শিথিল করিয়া দিবার জন্ত অনহর্যাকে অনুরোধ করে; তখন প্রিয়ঘদা হাসিতে হাসিতে বলে—

“এস্থলে পরোপায়বিস্তার-বর্জক নিজের যৌবনকে তিরস্কার কর; আমার দোষ কি?”

এই সরস বাঙ্গাটি সমরোচিত এবং বয়সোচিতও বটে। এই কথাটিতে যে কেবল মিষ্ট রসিকতা এবং নিজ দোষের স্ফালন মাত্র করা হইয়াছে, তাহা নহে! নারীজগদের স্বাভাবিক প্রেমভূষণ যে বনবাসেও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, যৌবনের রসলাপ যে তপোবনের চতুঃসীমার মধ্যেও ফুটিয়া উঠে, স্বভাবের কোলে পালিতা বনলতিকাও যে উজ্জানলতার গুণ সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়, আশ্রয়ের বেদসঙ্গীতের মধ্যেও যে প্রণয়-দেবতার গুণগুণ ধ্বনিও স্তনিতো পাওয়া যায়—কবি প্রকারান্তরে আমাদেরিগকে ইহাই বুঝাইলেন। রক্ত-মাংসে গড়া মানবীর জন্ম সর্বত্রই সমান। যৌবনের প্রভাব সর্বত্রই অব্যাহত। শকুন্তলা যে পূর্বযৌবনা—এ ইঙ্গিতটিও কবি হৃদয়কে জানাইয়া দিলেন।

## অনসূয়া ও প্রিয়দর্শনা

শকুন্তলা যখন “ঐ চূত তরুটি বায়ু-চঞ্চল পল্লবাকুলি দ্বারা আমাকে কি যেন বলিতেছে ; আমি যাই, উহাকে আদর করি”, বলিয়া তরুটির নিকট গেল। তখন প্রিয়দর্শনা মৃদুহাস্তে শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

“শকুন্তলে এই তরুটির নিকট তুমি মুহূর্তকাল দাঁড়াইয়া থাক। তুমি সমুদ্রে থাকিলে তরুটি লতা-সনাথ হইয়া শোভা পাটবে।

ভিতরে ভিতরে স্বভাব-সুলভ অদম্য প্রেমতৃষাণি যে অন্তঃসলিলা কস্তুর মত বর্ধমানা তাহা প্রথমেই বুঝা গিয়াছে। \* এক্ষণে আবার সেই প্রেমতৃষার উপশমের পাণ্ডটি সম্বন্ধেও যে—তাহাদের দিব্যজ্ঞান বিস্তারিত, তাহাই এক্ষণে পরিষ্কৃত হইল। শকুন্তলার বিবাহ না হইলে আর মানাইতেছে না, বিবাহের জন্ত ঋষিও বিশেষ বাগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন—তাহাও জানিতে পারা গেল। শকুন্তলার বিবাহের ফল ফুটিয়াছে, এখন ভ্রমর আসিলেই হয় ; তাহারও আর বড় বিলম্ব নাই। প্রিয়দর্শনারও ফল ফুটিয়াছে ; অনসূয়ারও ফল ফুটিবার অবস্থায় আসিয়াছে।

বনতোষিণী নব-মালিকার অঙ্গে হুতন কুমুম ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর সেই নবকুমুম-ঘোবনা নবমালিকা আপনায় বাহু-বেষ্টনে সহকার-তরুটিকে জড়াইয়া আছে,—শকুন্তলা তাহাই একদৃষ্টে দেখিতেছিল। প্রিয়দর্শনা তাহার মধ্যে এক হুতন সৌন্দর্য লক্ষ্য করিল। হাসিতে হাসিতে বলিল “অনসূয়ে জান কি, কেন শকুন্তলা বনতোষিণীকে এত করিয়া দেখিতেছে ? দেখ বনতোষিণী যেমন এই সহকার-তরুটিতে সজ্জা হইয়াছে, আমিও কি এই প্রকার অঙ্গরূপ বরের সহিত মিলিতা হইতে পারিব ?”

প্রিয়দর্শনা রসিকতার মধ্য দিয়া মধুবৃষ্টি করে, হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় রসমাধুর্য ঢালিয়া দেয়। শকুন্তলা যখন “প্রিয়দর্শনে, তোমাকে একটি প্রিয় সংবাদ দিই” বলিয়া আনুল-মুহূর্তিত মাধবী লতাটিকে দেখাইল। বিস্ময়িত-

চকু প্রিয়বদা সহর্ষে তাহা দেখিল। প্রত্যাগমনমতি প্রিয়বাদিনী তৎক্ষণাৎ উত্তরও দিল—“সহি তেন হি পড়িপ্রিয়ং দে নিবেদেমি” সখি, আমিও তোমাকে প্রতিপ্রিয় (উন্টাপ্রিয়) সংবাদ দিই। তুমিও “আমর পাণি-গ্রহনা” হইয়াছ। মাধবীলতা আমূল মুকুলিতা—ইহা শুভলক্ষণ। সাধে কি “প্রিয়বদা” প্রিয়বদা।

প্রিয়বদা শকুন্তলার কর্ণে রস-সলিলধারা ঢালিয়া দিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিতেছিল, কিন্তু সে সলিলধারা যে রাজা ছদ্মস্তের হুতন আশা-বীজটিকে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে অকুরিত করিয়া দিতেছিল—তাহা অবশ্য প্রিয়বদা জানিতেছিল না।

“উহা তোমার নিজেরই মনের কথা” বলিয়া শকুন্তলা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিল। বস্তত পতিসনাগমের জন্ত শকুন্তলা যে লালারিতা এবং উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে। তপোবনের পবিত্রতার মধ্যে যে বাস করে, সে ত আর বিলাসের কোলে পালিতা বিলাসিনী যুবতী নহে যে, ব্রহ্মসাক্ষী হইয়া উঠিবে। তবে তাহার সুপরিপুষ্ট নিটোল অঙ্গ, কুসুমিত উন্মাদক যৌবন, প্রেমরসোচ্ছল মধুর রসালাপ স্পষ্টই জানাইয়া দিতেছে যে, শকুন্তলার অন্তরের অন্তঃস্থল পাত-সমাগমাশায় ব্যাকুল। শকুন্তলা তৎক্ষণে অভাব অনুভব না করুক,—ব্যাকুল নাই হউক—তবে তাহার আরক্তিম কপোল, বিজ্ঞান্দাম-চর্কিত কটাক্ষ, মদনের রঙ্গভূমি সমুন্নত বক্ষ যে ব্যাকুল ও উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার আর সংশয় নাই। সে অধর চুষনে ব্যগ্র, সে বাহুলতা আনিজনে লালারিত, সে কটাক্ষ সন্ধান উন্মুখ। আমরাও একত্রে বলিতে পারি, “লাবণ্য চঞ্চল কিন্তু লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে”।

প্রিয়বদা বরন শকুন্তলার সেই চুরি করিয়া চাহিয়া দেখাটি লক্ষ্য করিল, প্রিয়বাদী প্রবণের প্রজ্ঞাশায় তাহাকে উৎকর্ণ থাকিতে

## অনসূয়া ও প্রিয়ষদা

দেখিল ; প্রায়-কোপ আর শৃঙ্খার-লজ্জার লুকোচুরি ধরিতে পারিল, তখন বুঝিল যে, শকুন্তলা রাজার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে। আবার বধন সে শকুন্তলার প্রতি রাজার করুণ সহানুভূতি, পরিচয় জানার অদমা কৌতুহল, অহেতুক প্রীতির আকর্ষণ লক্ষ্য করিল—তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, মৃগয়াবিধারী সম্রাট আজ হরিণ শিকার করিতে আসিয়া হরিণনয়নার কটাক্ষশরে বিদ্ধ হইয়াছেন। পৃথিবীর মালিক আজ এক বনবাসিনীর প্রভাবিতরল সৌন্দর্যের তিথারী সাজিয়া আসিয়াছেন।

প্রিয়ষদাই লতাকুঞ্জের মধ্যে শিলাপট্টের উপর পুষ্প-পল্লব বিছাইয়া শকুন্তলাকে শোয়াইয়া রাখিয়াছে। নলিনীপত্রের বাতাস দিয়া তপ্ত অন্ধ শীতল করিবার যত্ন লইতেছে। সে বাতাসে তিতরের তীব্র তাপ কিছুমাত্র শাস্তিলাভ করিতেছে না। শকুন্তলা এমতই আত্মবিস্ময়—সখীরা যে বাতাস দিতেছে, সে জ্ঞানই নাই। কি দুঃখময়ী অবস্থা ! প্রিয়ষদা সবিষাদে অনসূয়ার প্রতি চাহিল, জনান্তিকে বুঝাইয়াও দিল—

“এ বিকারের মূল রাজর্ষির প্রতি সখীর অনুরাগ। এ বিকারের একমাত্র ঔষদই রাজর্ষি সহ মিলন। এ সমাগম বাতীত অস্ত্র কোন উপায়ই নাই।

রাজা আসিলেন। নির্দাষতপ্তা পৃথ্বী শীতল হইল। নির্বাণপ্রায় দীপলিখা তৈলনিষেকে অসিয়া উঠিল। নিজীবপ্রায় শকুন্তলা-বল্লরী রাজার অনুরাগ-সলিল পাইয়া ধীরে ধীরে সজীব হইয়া দেখা দিল। রাজা লতাকুঞ্জে, ছায়া-স্নিগ্ধ কুসুম-শয্যায় শায়িতা শকুন্তলার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ষদার মধ্য দিয়া দুইটি হৃদয়ে প্রেমমধুর রসালোপ চলিতে লাগিল। দুয়ত্ত “উপভোগকম” সহকার, আর শকুন্তলা “নবকুসুম-যৌবনা” মাধবীলতা। সহকার শাখা-বাছ আলিঙ্গনে লতাটিকে বকের উপর টানিয়া লইবার উপক্রম করিতেছে, আর মাধবীলতাও তাহার বিস্তৃত বক্ষে আশ্রয় লইবার জন্ত কম্পিতা ও উন্মত্তা হইয়া

উঠিয়াছে। “হুইখানি মেঘই বিহাতে ভরা” প্রিয়দর্শনা বুঝিল, এ সময়ে আর থাকা উচিত নহে। সুগলিত ধরিবার ছলে প্রিয়দর্শনা অনঙ্গ্যাকে লইয়া পলাইয়া গেল।

শকুন্তলা ক্ষত্রিয় রাজর্ষির কন্যা এবং অপ্সারার গর্ভজাতা। দ্রুপদ ও শকুন্তলার স্পৃহনীর যোগা বর। আর চুইজনে চুইজনকে দেখিবামাত্র ভালবাসায় বাধাও পড়িয়াছে। ইহাদের মিলনও বিধাতার দান। প্রিয়দর্শনা এই সকল ভাবিয়া, বেশ করিয়া বুঝিয়া তবে উভয়ের অঙ্গের উত্তর বীজটিকে সলিলদানে অঙ্কুরিত করিয়াছে। সে বুঝিয়াছিল, এই অঙ্কুরিত বীজ শীঘ্রই তরুর আকারে দেখা দিবে। তজ্জন্তুই প্রিয়দর্শনা শকুন্তলার অনিচ্ছাকৃত গমনে বাধা দিয়াছে, এমন কি দূতগিরি করিতেও লজ্জা বোধ করে নাই।

শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার পূজার জগা সখীদ্বয় মালিনীতীবে পুষ্পচরনে ব্যগ্র, এমন সময়ে “অন্নমহং ভোঃ” ‘এক বিকট চীৎকারধ্বনি উদ্ভিত হইল। শকুন্তলা পর্ণশালার অভ্যন্তরে পতিচিন্তার এমন বিভোর—; তাহারই দ্বারের সম্মুখে সে ধ্বনি—তার কর্ণে একেবারেই প্রবেশ করিল না। শকুন্তলার মনটা তখন করনার লীলায়িত গতিতে হস্তিনাপুরে চলিয়া গিয়াছে। সে ভীষণ শব্দে সারা বনভূমি সম্ভ্রান্ত। মালিনী নদী করণ সঙ্গীত গাহিয়া বহমান। হরিণেরা অর্দ্ধভক্ষিত মুখকবল মুখে করিয়াই রহিয়াছে। পক্ষীরা তরুশাখায় নিস্তকে স্থিরভাবে বসিয়া আছে। সে ভৈরব গর্জনে পতিচিন্তার তন্ময়চিত্তা শকুন্তলার কর্ণে কোন স্পন্দন উঠাইতে না পারিয়া দূর আকাশের গায়ে বিলীন হইয়া গেল।

ভৈরব গর্জনে, মিশে গেল তন্ময়তা সনে—

সিন্ধু বেগ বালুকার হল প্রবাহিত” \*

## অনসূয়া ও প্রিয়শ্রদা

সেই সহস্র বজ্র-নির্বোধবৎ-ধ্বনি শুনিয়া বহুদূরবর্তিনী অনসূয়া ও প্রিয়শ্রদা চমকিয়া উঠিল। উদ্বিগ্নচিত্ত, স্থলিত চরণ, বিভ্রান্ত চক্ষু লইয়া সখীদ্বয় ছুটিয়া আসিল। দেখে—অগ্নিসম তেজস্বী হুর্কাসা ঋষি ক্রোধাক্রমে নেত্রে আশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেছেন। পদভরে ধরিজী কম্পবান। উঃ, কি বিবম বিপৎ! তখন শকুন্তলার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া সহচরীদ্বয় ছিন্নপক্ষ পক্ষিণীর মত হুর্কাসার চরণে লুটাইয়া পড়িল। ক্রোধাবতীর ঋষির কঠোর মর্শ্বতায় সমবেদনার একটি ক্ষীণ রাগিণী মাত্র বাজিয়া উঠিল। তপস্বিনী ঋষিকৃত্যাদের করুণ পরিদেবনে ঋষি এইটুকু মাত্র সাশ্বনা দিলেন যে, অভিজ্ঞানচিহ্ন দেখাইতে পারিলে তবে শকুন্তলার স্মৃতি দ্ব্যস্তের অন্তরে জাগিয়া উঠিবে। পরিণামে এই অভিজ্ঞানচিহ্নই দ্ব্যস্ত শকুন্তলার মিলনের কারণ হয়—তাই এই নাটক খানির নাম “অভিজ্ঞান-শকুন্তল”।

চতুর্থ অঙ্কে প্রিয়শ্রদাই অনসূয়াকে সংবাদ দিল যে, তাত কঙ্ক শকুন্তলার এই আত্মনিবেদনে বড়ই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। অঙ্ক প্রাতে লজ্জাবনতমুখী শকুন্তলাকে অভিনন্দিতা করিয়া বলিয়াছেন—

“বৎসে, ভাগ্যবশতঃ “ধূমনিরুদ্ধ-দৃষ্টি” যজ্ঞমানের আত্মতি ঠিক যজ্ঞীরাগ্নিতেই নিপতিতা হইয়াছে। “সংশিষা-পরিগৃহীতা” বিভ্রার মত তুমি সার্থক হইয়া উঠিয়াছ। অস্ত্রই তোমাকে আমি ঋষিগণের সাহায্যে পতিগৃহে প্রেরণ করিব।” এই গাঙ্কর্য্য বিবাহে প্রিয়শ্রদার যে একটুও ভয় ছিল না, তাহা নহে; সে ভয় আজ দূর হইল। শকুন্তলা সুখিনী হইবে, সে সংবাদ প্রিয়শ্রদা তাড়াতাড়ি অনসূয়াকে দিয়া গেল।

হর্য্যোদয়ে কৃতজ্ঞাতা শকুন্তলাকে তপস্বিনীরা স্বস্তিবাদ দিয়া আশীর্বাদ করিল। প্রিয়শ্রদা ও অনসূয়া আসিয়া প্রাণসখীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। একপ্রাণা, নিজেই প্রতিক্রিয়া-হানীয়া সখীদের ছাড়িয়া

বাইতে হইবে—শকুন্তলা কান্দিতে লাগিল। অনন্থরা ও প্রিয়দম্বা  
ঋষিকৃত্য, মঙ্গলকাণ্ডে যোদন অসুচিত—বলিয়া শকুন্তলাকে সাধনাও  
দিল; আবার নিজেরাও চক্ষুতে অঞ্চল দিয়া কান্দিতে বসিল। স্নেহের  
প্রকৃতিই এট।

প্রিয়দম্বা অত দুঃখের মধ্যে লক্ষ্য করিল, শকুন্তলা আর্গ্যপুত্র-দর্শনে  
উৎসুক হইয়াও তপোবন বিরহে বড় কাতরা হইয়াছে। প্রিয়দম্বা চারিদিক্  
চাহিয়া দেখিল—“উদ্যৌর্ণ-গর্ভকবলা” মৃগী, “পরিত্যক্তনৃত্যা” ময়ূরী,  
“অপমৃত-পাণ্ডুপত্নী” লতা প্রভৃতিও আজ অশ্রুবিসর্জন করিতেছে।  
প্রিয়দম্বার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। গর্ভভার-মহরা মৃগবধু আসিয়া  
শকুন্তলার সম্মুখে দাঁড়াইল, মাতৃহারা মৃগশিশুটি ধীরে ধীরে শকুন্তলার  
অঞ্চলাগ্র টানিতে লাগিল। সখীদের শেষ আলিঙ্গন দিয়া শকুন্তলা আশ্রয়  
ত্যাগ করিল।

আর অনন্থরা প্রিয়দম্বার আবগুক নাই। শকুন্তলার তপোবন  
ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অনন্থরা প্রিয়দম্বার কার্য্যও ফুরাইল। রক্তমঞ্চে  
সখীদ্বয়ের আবির্ভাব আর দেখা গেল না।

অনন্থরা প্রিয়দম্বা যে যোগ্যপাত্রের সমর্পিতা হইবে—ইহা আমরা  
ঋষি কথের মুখেই শুনিতে পাইয়াছি। ঋষিকৃত্যাদের যোগ্যবর যে  
ঋষিকুমার—এ বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই। ঋষি যে তাঁহার বড়  
সাধের শকুন্তলার প্রিয়-সখী দুটীকে প্রিয়-শিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের  
করেই সমর্পিতা করিবেন—ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি।  
শারদ্বতের যোগ্য অনন্থরা, শার্ঙ্গরবের অতুলপা প্রিয়দম্বা। অনন্থরা ও  
প্রিয়দম্বাকে আমরা কাদম্বরী কাব্যের পত্রলেখার মত কবির উপেক্ষিতা  
বলিতে পারি না।

অনন্থরা ও প্রিয়দম্বা শকুন্তলার দুইটি দিক্ মাত্র। অনন্থরা ও

## কালিদাসের শকুন্তলা

প্রিয়দর্শনকে ছাড়িয়া দিয়া শকুন্তলার নিজস্ব কিছু আছে কি না, আমরা জানি না। এই দুইটী সখী শকুন্তলারূপা জাহ্নবীকে বিবেচনাভিমুখে স্থির রাখিবার জন্য অসিবারণার মত দুইপার্শ্বে বিরাজমান। আবার বলি তবোবনবাসিনী শকুন্তলার স্বভাব-সরল কোমল দিকটিই অনস্বয়া। হৃৎকম্পমহিমা শকুন্তলার “আহার্য-শোভাময়” উজ্জল দিকটিই প্রিয়দর্শন।

---

## কালিদাসের শকুন্তলা।

কালিদাসের শকুন্তলা এক অপূর্ণ সৃষ্টি। তপোবনে-পরিহিতবস্ত্রা কুসুমভরণা কুমারী, রাজাস্তম্ভপুৰে—মণিরত্নভূষিতা রাজরানী। আশ্রমের শান্ত স্থল, নগরের রাজলক্ষ্মী। প্রেমের বিকট কুসুম, আরাধনার পরিপক্ব ফল। “প্রথমাবতীর্ণ-যৌবন-মদন বিকারা,” সমধিক লজ্জাবতী, মানে যুগ্ম, যুগ্ম নারিক।

ঋষির ঔরসজাতা, অঙ্গরা মেনকার গর্ভজাতা, তপস্বী কণ্ঠের পালিতা কন্তার এমন রূপ, এমন প্রভাতরস জ্যোতি, এমন অলৌকিক সৌন্দর্য্য জাহ্নবীতে সম্ভব নহে বলিয়াই কি সে অপ্সরা-সম্ভবা? পিতৃমাতৃ-ভ্রাতৃ কন্তা, শকুন্ত-পক্ষীর দ্বারা রক্ষিত। হইয়াছিল, তাই নাম শকুন্তলা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এবং অপ্সরা মেনকার কন্তা ক্ষত্রিয়ের বিবাহ হইবে, তাই কি ঋষি তাহাকে সেইমতই সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন? বাহাকে একদিন রাজার মহিষী, ভরভের মত পুত্রের জননী হইতে হইবে, তাহাকে সেইমতই গঠিত করা আবশ্যিক। তজ্জন্তই কি দুর্বদশী ঋষি শকুন্তলার উগর আশ্রমের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন? সহস্র প্রকার বে জননী



হইবে—তাহার স্নেহের প্রসার তাই কি তরলতা ও পশুপক্ষী তাবৎ প্রাণীতেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ?

শকুন্তলা সখীদ্বয়সহ স্বপ্রমাণানুরূপ সেচনঘট কক্ষে লইয়া ক্ষুদ্র তরু-  
গুলিতে জলসেচন করিতেছে ! সে তরুগুলির উপর শকুন্তলার সচোদরের  
অধিক স্নেহ পড়িয়াছে । শকুন্তলার মধুর-দর্শন রূপসৌন্দর্য্য সে উজানটি  
আলো করিয়া আছে । হৃদয়স্ত বৃক্ষান্তরালে অবস্থিত থাকিয়া যে তাহাদের  
প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা তাহারা কেহই জানে না । আশ্রমবাসিনী  
রমণীদের রাজাস্তঃপুর-ভল্লভ রূপ দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন । এমন-  
প্রকৃতি-মনোরম দেহ কি কখনও তপস্কার ক্লেশ সহ্য করিতে পারে—  
মনে করিয়া রাজা ঋষির উপর একটু অশ্রুযোগও করিলেন । শকুন্তলার  
বক্ষোদেশ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ; অনন্থয়া বকল শিথিল করিয়া দিলে হৃদয়  
দেখিলেন—বকলসাজে শকুন্তলা কি সুন্দর ! তাহার পল্লব-রক্তিম অধর,  
কোমল শাখা-সদৃশ বাহু, কুসুম-লোভনীয় যৌবন কি মনোরম ! যদিও  
ইহারা তপস্বীর কন্যা, তথাপি যৌবন লইয়া রঙ্গও করে, সহকারের সঙ্গে  
মাধবীলতার বিবাহও দেয় । রাজার হৃদয়ে আশার ক্ষীণজ্যোতি ধীরে ধীরে  
ফুটিয়া উঠিল ।

শকুন্তলা তপস্বীকন্যা, কিন্তু তপস্বিনী-ভাবাপন্ন নহে । নতুবা যৌবন-  
সম্বন্ধীয় রসালাপ তাহার এত মধুর লাগিবে কেন ? সে প্রবৃত্তিরই সেবিকা  
—নচেৎ লতাকে স্বরধর-বধু করিয়া সহকারের সঙ্গে বিবাহ দিবে কেন ?—  
আবার সেই লতাকে নবযৌবনা দেখিয়া, সহকারকে “উপভোগক্ষম”  
মনে করিয়া আনন্দলাভই বা করিবে কেন ? শকুন্তলারও ফুল ফুটিয়াছে,  
এাণে ভালবাসার সাধ জাগিয়াছে—তাই সে মুকুলিতা মাধবী লতার পানে  
স্নেহে দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে । তাহারই মনোগত নিগূঢ় ভাবটি প্রিয়বলা  
রজরসের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলে ।

## কালিদাসের শকুন্তলা

শকুন্তলার ফুল ফুটিল। মধুলোভী ভ্রমরও আসিয়া দেখা দিল। মানব-ভ্রমর রাজা ছয়স্তও তপস্বি কত্যাগণের রক্ষাছলে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অবসর বুধিয়া মদনদেবতা ফুলশর নিক্ষেপ করিলেন। সে ফুলশর তীক্ষ্ণ লোহশলাকারূপে শকুন্তলার কোমল বক্ষ ভেদ করিল। “অজ্ঞাত-যৌবন-মদন-বিকারী” বাল্য বিচলিত হইয়া উঠিল। “ইহাকে দেখিয়া আমার তপোবন বিরোধী ভাব জাগিতেছে কেন?” বলিয়া শকুন্তলা বিস্মিত হইল। বিজ্ঞানিকার বলে কুমারী মনে মনে অবশ্যই বুঝিল—ইহা মদন-দেবতার খেলা।

শকুন্তলার অন্তর তখন অতিথির পরিচয় জানিবার জন্ত ভিতরে ভিতরে উৎকণ্ঠিত। তাহার ইচ্ছাই তখন অনন্তরায় মুখ দিয়া যেন বাহিরে প্রকাশ পাইল। সাহুরাগ লজ্জা আসিয়া কুমারীর মুখে, চক্ষুতে, সর্বাঙ্গে একটি পুলক-শ্রী ফুটাইয়া তুলিল। কাহাকে দেখিবামাত্র কাহারও হৃদয়ে যে একটি রসময়ী বৃত্তি জাগিয়া উঠে—উহার নাম পূর্বরাগ, চক্ষুরাগ, তার-মৈত্রিক, ও অহেতুক প্রেম বা মদনশরজ্ঞ ভাব।

শকুন্তলার আকারে ভাবভঙ্গীতে ইহা প্রথম অস্পষ্ট প্রকাশ পাইল। তারপর ছয়স্তের মুখে “প্রভাতরল জ্যোতি পৃথিবীতলে কখন ফুটে না” শুনিবামাত্র তাহার কপোল ছ’টা এমন রক্তিম হইয়া উঠিল, মুখখানি এরূপভাবে ভূমি-স্বস্ত হইয়া গেল—তাহাতে ঐ অস্পষ্টতা স্পষ্ট হইয়াই দেখা দিল।

কিশোরীর হৃদয়ে প্রথম প্রেমসকার বড় মধুর। “আমি বাই” বলিয়া সেই অকুলি তর্জন, সেই কৃত্রিম কোণ প্রকাশ, সেই অনিচ্ছাকৃত প্রহ্মানোদ্রোগ বড়ই হৃদয়গ্রাহী। প্রেমশাত্রেয় সহিত কথা কহিতেছে না, কিন্তু তাঁহার কথাগুলি উৎকর্ষ হইয়াই শুনিতেছে; তাঁহার দিকে ভাল করিয়া তাকাইতে পারিতেছে না, অথচ অন্তরিকে অধিকক্ষণ চক্ষুকে

নিবিষ্ট রাখিতেও পারিতেছে না। কুশলচিত্তে বিদ্ধ চরণ ছ'খানি যেন চলে না; কুরুবকশাখার সঁলগ্ন অঞ্চলখানিও যেন অগ্রগমনে বাধা দিতেছে। অথচ সেই অবসরে বিলম্ব করিয়া কিরিয়া কিরিয়া দেখিয়া লওয়াটিও চাই—কি সুন্দর দৃশ্য!

শকুন্তলা এইরূপে নবপ্রণয়-স্বলভ অকৃত্রিম ছলাকলার মধ্য দিয়া আপনার ভালবাসাটি নিবেদন করিল। কুমারীদের “বুক কাটে ত, মুখ কোটে না” সত্য; আবার ভাবভঙ্গী ও বিলাসবিভ্রমের ভিতর দিয়া সহজে তাহারা ধরা পড়িয়াও যায়।

মালিনী-ভীরবর্তী লতামণ্ডপে শিলাপট্টের উপর কুসুমাস্তরণে শকুন্তলা শায়িতা। জলনীলনী যেন শীতল সলিল-শয্যা ছাড়িয়া প্রস্তরের উপর নিপতিতা। প্রচণ্ড তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া লাবণ্যময়ী ছায়া আজ স্ত্রিয়মাণা। বকের উপর ঘন করিয়া উশীরের অমূলপন। সখীরা ধীরে ধীরে কমলদল সঞ্চালনে ব্যজন-রত। কুসুম-কোমলা বালা আজ মদনের ভীক শরে আহতা হরিণীর মত অবস্থায় উপনীতা। এমত জ্ঞানহারা—সখীরা যে বাতাস দিতেছে,—সে উদ্বোধ পর্য্যন্ত নাই। সে সকল ভালবাসার মাহুত মুখ, দৃষ্টি ও উন্নত হইয়া থাকে, শকুন্তলা আজ সেই ভালবাসা বাসিয়া এই দশায় নিপতিতা। সে লাবণ্যময়ী সৃষ্টি আজ পাণ্ডুরবর্ণা, সে যৌবনোৎকৃষ্ট মুখকান্তি বড় ম্লান, বড় হৃৎখদর্শন। মদনের শক্তি কি অমোঘ! সেই নবদল-সিদ্ধা মাধবী লতা দুই দিনের মধ্যেই এমত বিগুহা হইয়া উঠিয়াছে।

কিস্ত উপায়? কোন্ ঔষধে এ হরিণী সুস্থ হইবে কোন্ ব্যক্তিসেই এ মাধবীলতা বাঁচিবে? শকুন্তলা সখীদের কাছে নিজমুখে আপনার ভালবাসার কথা জানাইল; যাহাতে রাজার অশুকম্পার পাণ্ডী হয়, তৎক্ষণ উপায় করিতে অনুরোধ করিল। নতুবা সে আর বাঁচিবে না। তখন

## কালিদাসের শকুন্তলা

প্রিয়বদা—শকুন্তলারই ভবিষ্যৎ মূর্তি—দেবসেবাচ্ছলে পুন্শয়াশির মধ্যে মননলেখন পাঠাইবার যুক্তি দিল। পাছে অবজ্ঞাতা হয় সেই ভরেই শকুন্তলা কাতরা। ব্রহ্ম সর্বদাই অনিষ্টাশঙ্কী। প্রিয়বদা তখন শকুন্তলারই আশার ছবিটি মূর্তিমতী করিয়া দেখাইল ; বলিল

“আত্ম-গুণাবমানিনি, তাপভয়ে শারদীয়া জ্যোৎস্নাকে আতপত্র দিয়া কে নিবারণ করে ?” শকুন্তলা ইহাই শুনিতে চাহে, তখন তার স্নানমুখে কৌণ অথচ উজ্জ্বল একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিমেষের মধ্যেই প্রেম-নীতিকা রচনা করিয়া শকুন্তলা প্রিয়বদার হাতে দিল—

“নিষ্ঠুর, তোমার হৃদয় আমি জানি না ; কিন্তু মদন—কি দিবা, কি রাত্রি—তব হস্তাভিলাষী আমার সঙ্গে নিদারুণ তাপ জন্মাইতেছে।”

পত্র প্রেরণ আর করিতে হইল না। অহুকুল-সৌভাগ্য সম হৃদয় আসিয়া সহসা প্রবেশ করিলেন। শকুন্তলার-প্রেম গীতিকার উত্তর দিবার ছলেই কহিলেন—

“হে কুশাদি ! মদন তোমার মত আমাকেও দগ্ধ করিতেছে। দিবা কুমুদিনীকে যতখানি স্নান করে, শশাককে তদপেক্ষা অধিক স্নান করিয়া থাকে।”

রাজাকে দেখিয়া সখীরা স্বাগত সম্ভাষণ করিল। শকুন্তলাও উঠিবার প্রয়াস পাইল কিন্তু তাহার আর উঠা হইল না। নির্বাকোন্মুখ নীপ-শিখা তৈলসেকে অলিয়া উঠিল। উপযুক্ত ঔষধ পাইয়া সে রিকার উপশম প্রাপ্ত হইল। সে তাপদাহ কোথায় মিলাইয়া গেল, তাহার স্থলে অরবিন্দ-স্মরতি তরঙ্গ-নীতল মৃদুমান বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। শকুন্তলা জানিল—হৃদয় তাহাকে ভাল বাসিয়াছেন, তাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন—আনন্দে শকুন্তলার বক করিয়া গেল।

শকুন্তলার হৃদয়ের কথাটি অনুয়া প্রকাশ করিয়া অহুরোধ জানাইল—

“আপনারই কৃত্ত আশার সখী মদনের দ্বারা এই অবস্থার উপনীতা ; এক্ষণে অহুগ্রহ করিয়া যাহাতে ইহার প্রাণ রক্ষা হয়, তাহাই করুন।” রাজা অহুগ্রহীত হইলেন, এই ভাব তিনি প্রকাশও করিলেন। শকুন্তলা কিন্তু পেটে ক্ষুধা, মুখে লাজ” জাতীর কুমারী, তাই সে অনন্থরাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

“সখি, অন্তঃপুর-বিরহ-পয্যুৎসুক রাজর্ষিকে অহুরোধ করার প্রয়োজন নাই।”

শকুন্তলার ইচ্ছা—রাজা যাহা করিবেন, তাহা আপনা হইতে প্রণয় বশতই তাহা যেন করেন ; এবং সেই কথাটীও শকুন্তলা প্রিয়তমের মুখেই শুনিতে চায়। শুনিতে তাই। সমুদ্রবসনা পৃথিবীর সহিত আপনার তুলনা শুনিয়া যেষবাতস্পর্শে নিদাঘার্ভা ময়ূরীর মত প্রত্যাগত-জীবিতা ও কৃতার্থ হইল।

শকুন্তলাকে রাজার নিকট রাখিয়া অনন্থরা ও প্রিয়দম্বা চলিয়া গেল। শকুন্তলা প্রথম প্রণয়ে ব্রতী—এ সুতন সাহসের কার্যে অগ্রসর হইতে সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল—

“পৃথিবীনাথ বাহার কাছে রহিলেন—সে ত অসহায় নহে আর একাকিনীও নহে” এই বলিয়া প্রিয়দম্বা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

“কি, সখীরা গেল ?” প্রণয়ব্যাগারে অনভ্যস্তা শকুন্তলার কেমন একটু ভয় জন্মিল। অনাত্মাত সন্তো-বিকসিত কুঁহুনের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক।

হৃদয়ের ভালবাসার আত্মমধুর বচনে শকুন্তলা বুঝা হইল। রাজা হৃদয়তখন রাজকৃত্ত-কস্তারের গাঢ়ক বিবাহের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শকুন্তলাকে ক্রমেই সাহসিনী করিয়া তুলিতেছিলেন।

এইরূপে উভয়ের প্রেমবেলা চলিতে লাগিল। অনন্থরা ও প্রিয়দম্বার

## কালিদাসের শকুন্তলা

বিনা উপস্থিতিতে, গাঙ্কর্য বিবাহের আয়োজন সমাপ্ত হইবার পূর্বেই দাম্পত্য মিলনের পরিপূর্ণতা সাধন করা কবি ভাল বুঝিলেন না, দেশের পক্ষে, সমাজের চক্ষুতে উহা অনিষ্টকর বলিয়াই বোধ করিলেন, তাই তিনি ঐ সময়ে শান্তি-উদক হস্তে গৌতমীকে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

উপযুক্ত কার্যক্ষেত্রেই বুদ্ধি খোলে। শকুন্তলা তখন রাজাকে শাখাস্থরিত থাকিবার পরামর্শ দিল। তারপর গৌতমীর সহিত সে লতামণ্ডপ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল,—তত্ত্বির আর উপায়ও ছিল না। নূতন প্রণয়ের মিলনাবেশে বিভোরাবাল! ভাবিল—

“হৃদয়, যেমন তুমি সুখোপনত মনোরথ-পূরণে কালহরণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার ফল ভোগ কর।”

বুঝা গেল—শকুন্তলার নিজের উপর আর কোন প্রভুত্বই নাই। এক্ষণে সে দ্বন্দ্বস্তে সম্পূর্ণরূপেই আত্মসমর্পণে উদ্ভত ও উৎসুক হইয়াছে। তখন চলিয়া যাইবার সময় লতামণ্ডপকে লক্ষ্য করিয়া কহিয়া গেল—

“লতাকুঞ্জ (নিকুঞ্জ), সস্তাপহর, তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আমি আবার তোমাকে অভিনন্দিত করিব।” লতাকুঞ্জকে উদ্দেশ্য করা—একটা ছল মাত্র। দ্বন্দ্বস্তকে মিলিত হইবার ইঙ্গিত করা, আর আমিও আবার মিলিত হইব—এই আশা দেওয়াই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

প্রণয়ই মানুষকে অনেকরূপে শিক্ষা দেয়, নূতন রকমে গড়িয়া তোলে। প্রণয়-প্রসাদে হাবভাব-বিহীন সরলা নারীও কলাকুশলা ও চতুরা হইয়া থাকে। শকুন্তলাই তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

বহুবি উপযুক্ত ভাবিয়া বাহ্য হস্তে আশ্রমের গুরুভার তুল্য করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন—সেই শকুন্তলা আজ আপনার সুখ হৃৎকম্প লইয়া ব্যস্ত। গুরুতর কর্তব্যের তার বাহার মাথার উপর—এ আত্মদয়, এ দুর্বলতা তাহার সাজে না। এত বড় কর্তব্যের চ্যুতি বাহারই হটক থাকেন—

তাহার তাহা দোষ। দোষ দোষই। বালক বালিকা না বুঝিয়া যদি অগ্নিতে হাত দেয়, অগ্নি তাহাকে দণ্ড করিতে ছাড়ে না।

শকুন্তলা বালিকা, অসামান্য সুন্দরী, বিশেষত পতিচিন্তায় আত্মহারা ; তাহার দোষ সকলকার নিকট মার্জ্জনীয় ; তাহার উপর সমানুভূতি আসা সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। এ মার্জ্জন', এ সমানুভূতি—দয়ারূপিত-উদ্ভূত দুর্দলতা মাত্র। দেবরাজ ইন্দ্রই হউন আর প্রণয়বিবশা বালিকাই হউক,—দোষ করিলে দণ্ড লইতেই হয়। দোষের বিচারক দণ্ডদানের কর্তাকে দয়ালু এবং দুর্দল হইলে চলে না। দেবরাজ বলিয়া ইন্দ্রের দোষ যিনি মার্জ্জনা করেন নাই, প্রণয়বিবশা বালিকা বলিয়া তিনি শকুন্তলার ত্রুটিও মার্জ্জনা করিলেন না। দুর্দাসা ক্রোধের অবতার, কর্তব্যচ্যুতির জন্ত দণ্ড দিয়া গেলেন মাত্র।

অগ্নিগৃহ-প্রবিষ্ট মহর্ষি অশরীরিণী বাণী শুনিয়াই শকুন্তলার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। “ধূমনিরুদ্ধ-দৃষ্টি” যজ্ঞমানের আহুতি আজ সৌভাগ্যবশত যজ্ঞীয় অগ্নিতেই নিপতিতা হইয়াছে। শকুন্তলা দুঃস্বপ্ন-দত্ত ভোজ ধারণ করতঃ অগ্নিগর্ভ শরীর মতই পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। তখন মহর্ষি শকুন্তলাকে হস্তিনাপুরে দুঃস্বপ্নের নিকট প্রেরণ করাই সমীচীন মনে করিয়া গৌতমীকে আদেশ দিলেন—“শার্ঙ্গর্য ও শারদ্যতকে সঙ্গে লও, শকুন্তলাকে পতিগৃহে রাখিয়া আইস।”

এত দূরপথে সৌভাগ্যের মত প্রবীণা স্ত্রীলোককে অতিভাবিকারূপে সঙ্গে বিয়া ঋষির অতিথয় সাংসারিক দৃষ্টান্তসমূহই পরিচয় দিয়াছেন। শার্ঙ্গর্য স্টবকা, তেজস্বী, অস্ত্রায়সহিষ্ণু এবং ঋষিহীনত কোপন-স্বভাব ; শারদ্যত প্রিয়ভাষী, বিনয়-বস্তুগতঃ সম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি, ও তপস্বিহীনত-স্বাক্ষরিত।

শকুন্তলা আজ পতিগৃহে বাইবে, তপস্বিনী রাজরাণীর আসনে বসিবে—

## কালিদাসের শকুন্তলা

কি আনন্দের কথা! কিন্তু সেই আবাল্য পরিচিত আশ্রম, সেই সমৃদ্ধ-  
মুখ একপ্রাণা সখীগণ, সেই সন্তান-নির্বিবশেষে পালিত মৃগ, তরুলতা ও  
পশুপক্ষী ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এ কি কম কষ্টের কথা! সখীরা  
শকুন্তলাকে কত আদর করিয়া সাজাইয়া দিয়া আসিতেছে, আজ সেই  
সখীদের হাতে তাহার শেষ সজ্জা;—মনে হইবামাত্র শকুন্তলার চক্ষু  
বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। পতিসমাগম-বাকুলা হইয়া শকুন্তলা যদি  
হাসিতে হাসিতে তপোবন ছাড়িয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা তাহাকে  
হৃদয়হীনা, ভোগপরায়াণা ও বিলাসিনী বলিয়া ভাবিতাম। পিতা মাতা,  
ভ্রাতা ভগ্নী ও সখাসখীদের ছাড়িয়া যাইতে যার কষ্ট না হয়—সে কেমন  
রমণী! শকুন্তলা এমন স্বার্থপর, আত্মভোগ-সর্বস্বা রমণী নহে।

স্বানোত্তীর্ণ ঋষি উৎকণ্ঠিত হৃদয়, বাষ্পভারাবরুদ্ধ বচন, চিন্তাজড় নয়ন  
লইয়া শকুন্তলার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লজ্জার নতনয়না কত  
গিতাকে কেবল শ্রুণাম মাত্র করিল। মুখ দিয়া তখন তাহার কোন  
কথাই বাহির হইল না।

মহর্ষি কথ তখন আশ্রমের তরুদিগের নিকট শকুন্তলার বিদায় প্রার্থনা  
করিলেন—

“বাহাদিগকে জলসেচন-তৃপ্ত না করিয়া শকুন্তলা জল খাইত না,  
ভূষণ-প্রিয়া হইয়াও বাহাদিগের প্রতি স্নেহবশে পল্লব গ্রহণ করিত না,  
বাহাদের নব-কুসুমোদগম হইলে সে উৎসব বলিয়া মনে করিত—সেই  
শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাইতেছে; “সরিহিতদেবতা” তপোবন-তরু,  
ভোমরা অহুজা দাও।”

তপোবনের তরুস্রাও কোকিল-কলকণ্ঠের ধ্বনিতে সে অহুজা প্রদান  
করিল। রাত্তরিক মনে হয়, যেন তপোবন তরুগুলি এক একটী রক্ত-  
মাংসে গড়া হৃদয়-সম্বিভ সচেতন জীব। অচেতনে চেতনের প্রতিষ্ঠা



করা, জড়কে মূর্তিমান করিয়া জেলাই প্রকৃত অলৌকিক কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। এ চিত্র হৃদয়ে শান্তি ও পবিত্রতা আনিয়া দেয়, অভিনব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এ যেন একাধারে নন্দন-কাননের সুসমা, ভাগীরথীর পুণ্য প্রপাত। এ যেন স্বপ্নের কুল, আরাধনার কল!

শকুন্তলা জনাস্তিকে—আর কেহ শুনিতে না পায়—এমন ভাবে প্রিয়বদ্যকে কহিল,—

“সখি, আমি আৰ্য্যপুত্রের দর্শনলাভের জন্য সমুৎসুক হইয়াছি বটে, কিন্তু আমার চরণ যে তপোবন ছাড়িয়া বাইতে চাহে না।”

শকুন্তলা যেমন তপোবন-বিরহে কাতরা, শকুন্তলারও আসন্ন-বিরহে তপোবনের অবস্থা একই প্রকার। হারণীরা তৃণকবল মুখে করিয়াই রাখিয়াছে, ময়ূরীরা নৃত্য ছাড়িয়া দিয়াছে, লতারা শুষ্ক পত্রগুলি কেলিয়া যেন বাষ্প বর্ষণ করিতেছে। কাব্যের অলঙ্কারগুলি সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিল। জন্মের ভাবনিচয় মূর্তি ধরিয়া দেখা দিল।

শকুন্তলা তখন ভগিনীরূপা মাধবীলতার নিকটে গেল। তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—

“লতা বহিন, তোমার শাখাময় বাহু দিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর— আজ আমি অনেক দূরে চলিলাম।”

পিতার দিকে কিরিয়া বেহরী কজা অশ্রুরোধ করিল, “বারী, ইহাকে আমারই মত ভাবিয়া ভালবাসিও।”

সখীদের নিকট গিয়া কহিল “এই মাধবীলতাকে তোমাদের হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলাম।”

শকুন্তলার সহোদরা ছিল না; সে সাধ মাধবীকে দিয়াই মিটাইয়া লইয়াছে। ভগিনীকে ভগিনীদের হাতে দিয়াই সে এখন নিশ্চিন্ত হইল।

## কালিদাসের শকুন্তলা

গর্ভভার-মহুড়া যুগবধু আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। তখন শকুন্তলা পিতাকে অহুরোধ করিল, “বাবা, এট উটজচারিণী যুগবধুর বধন প্রসব হইবে, তখন আমাকে সে সংবাদ দিতে তুলিও না।” প্রসবকালে বিপৎ ঘটবার সম্ভাবনা, ইহা যে বড়ই বহুলাপ্রদ—রমণীমাত্রেই তাহা জানে। তজ্জন্ত রমণীরা ব্যাকুল হইয়া থাকে। ইহা তাহাদের আশৈশব প্রকৃতি।

পশ্চাৎ হইতে কে যেন বসনাগ্র টানিতে লাগিল,—শকুন্তলা কিরিয়া দেখে—বাহার কুশহুটি-বিক্রম মুখে কত আদর করিয়া সে ত্রশনাশক ইন্দুরী তৈল সেচন করিয়াছে, যে মাতৃহারা সন্তানটিকে হাতে করিয়া সে নীবার-মুষ্টি খাওয়াইয়া বড় করিয়া তুলিয়াছে—সেই যুগলিওটা ছল ছল নেত্রে সম্মুখে উপস্থিত! শকুন্তলার চক্ষু জনে ভরিয়া আসিল। শকুন্তলা যে দুই দিন পরেই পুত্রের মাতা হইতেছে; কেমন করিয়া পুত্রকে মানুষ করিতে হইবে, সে শিক্ষা তাহার কৃত্রিম পুত্রকে দিয়া অগ্রেই হইয়া গেল।

তখন কান্দিতে কান্দিতে শকুন্তলা সেই চিরপরিচিতা সরসীর তীরে বটতরুর ছায়ায় গিয়া বসিল। সেখানেও দেখে—চক্রবাক তাহার প্রিয়র সঙ্গে আলাপ করিতেছে না—মৃগালখণ্ড মুখে রাখিয়া সে এক স্ট্রে তাহারই পানে তাকাইয়া আছে। চক্রবাক সাধারণ্যে বিরহ ভোগ করিয়া থাকে; ভালবাসা কাহাকে বলে, তাহা সে (চক্রবাক) ভালরূপই জানে। শকুন্তলার বিরহ সে মর্মে মর্মেই অনুভব করিতেছে।

এইবার তপোবনের সীমানা ছাড়াইয়া পথ বরিতে হইবে। তখন শকুন্তলা পিতাকে শেষ আলিঙ্গন করিয়া কহিল, “বাবা, তোমার কাছ ছাড়া হইয়া মলয়পর্বত-চূড় চন্দনলতার মত কেমন করিয়া আমি বাঁচিয়া থাকিব?”

সখীদের কাছেও শেষ বিদায় লইয়া বলিয়া গেল, “সখি, তোমরা হুজনে এক সঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন কর।”

আবার পিতার দিকে কিরিয়া শেষ প্রার্থনা করিয়া বলিল, “বাবা, কবে আবার তপোবন দেখিতে পাইব?”

এ বাওয়া ত আর দুই দশদিন, দুই একমাস বা দুই এক বৎসরের জন্ত নহে। পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার পর তবে পতির সহিত এই তপোবনে আসা ঘটবে—সে কতকাল!

রাজসভায় তপস্বিগণের সহিত শকুন্তলা আসিয়া উপস্থিত হইল। অবগুষ্ঠন-বতী “পরিস্ফুট-শরীরলাবণ্য।” পাণ্ডুপুত্র-মধ্যে কিসলয়ের মত তালসবালা সভাসদ সম্মুখে দাঁড়াইল। তপোবনে প্রবেশের সময়ে হুহুস্তের বরষা-লাভহুচক দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইয়াছিল, আর রাজসভায় প্রবেশ করিয়া শকুন্তলার দক্ষিণ নয়ন কম্পিত হইল। আমাদের শাস্ত্রে বলে—বাহাদের অন্তঃকরণ নির্মল—তাহারা পূর্বেই শুভাশুভ ঘটনার আভাস পাইয়া থাকেন।

প্রতিহারীর মুখে শকুন্তলার রমণীয় আকৃতির কথা শুনিয়া রাজা যখন পরজীর মুখদর্শন অহুচিত বলিলেন, শকুন্তলার অন্তর তখনই এক অনিশ্চিত আশঙ্কার কাঁপিয়া উঠিল। আর্ঘ্যপুত্রের সেই গাঢ় ভালবাসা স্বরণ করিয়া সরলাবালা তখন স্পন্দিত বক বাহু দুটা দিয়া চাপিয়া রাখিয়া কোন মতে ধৈর্য ধরিয়া রহিল।

শাপ-প্রভাবে বিগত-স্মৃতি রাজা যখন বিবাহ ব্যাপারটিকে “উপভ্রষ্ট সিংহ” বলিয়া প্রকাশ করিলেন, তখন অভাগিনীর আশঙ্কা সত্য হইয়া উঠিল। সমস্ত-পোষিতা আশালতাটা চিরদিনের মত ছিন্ন হইয়া গেল। ছিন্নমূলি শরৎকালে শকুন্তলার উপরই প্রমাণের জার অর্পণ করিল; অভাগিনী তপস্বিনী শকুন্তলা কি করিবে? সেই প্রশ্নটো ভাল-

## কালিদাসের শকুন্তলা

বাসার যখন এই অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তখন স্বরণ করাইয়া দেওয়ার কল কি? মনস্বিনী আত্মসম্মান-যুতা নারী যাহা ভাবিতে পারে, শকুন্তলা তাহাই ভাবিল; অথচ এ অবস্থায় আত্মশুদ্ধির জন্ত, সতীর মর্যাদা বজায় রাখার জন্ত, প্রমাণ দেওয়া ব্যতীত আর তাহার উপায়ান্তর ছিল না। অভাগিনী সীতাও একদিন আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল। শকুন্তলা ভূমিকামাত্র করিয়াছে, এমন সময়ে রাজা তাহাকে “কুলঙ্কবা” নদী বলিয়া গালি দিলেন। আঘাতের উপর আঘাত! সতী নারী সকল সহিতে পারে কেবল সতীত্বের উপর আঘাত সহ্য করিতে পারে না। সহিসুতাময়ী শকুন্তলা তথাপি বৈধব্য ধারণা প্রমাণ দিতে বসিল।

“এক—অঙ্গুলীতে প্রণয়চিহ্নরূপে প্রদত্ত অঙ্গুরীর যে নাই! অভাগিনী বসিয়া পড়িল।

তখন সেই রাজসভা মধ্যে রাজার কি হৃদয়হীন তীক্ষ্ণ বিক্রম!”

শকুন্তলা তখন ‘মরিয়া’ হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রমের সরলা বৃগী তখন যেন সিংহীর আকার ধারণ করিয়াছে।

সেই তীক্ষ্ণ উপহাস, সেই মন্দান্তিক অবজ্ঞার ভিতর দিয়াই অভাগিনী সম্রাটের চিত্তে পূর্বস্মৃতি উদ্বীপ্ত করিবার কতই চেষ্টা করিল; সর্ব উপায়ই তখন ব্যর্থ। সেই আত্মনিবেদিতা তপস্বিনী আজ সর্ব সমক্ষে মিথ্যাবাদিনী, ছলনাময়ী ও অসতীকূপে প্রমাণিতা হইল। সতীর পুত্র বেত্তার পুত্ররূপে ঘৃণিত হইবে—উঃ, এ লজ্জা অসহ্য! সহিসুতাময়ী ধরা আজ ভূমিকম্পে বিদীর্ণপ্রায়। শকুন্তলার বাক্য অলিত, দৃষ্টি বাস্প-কলুষ, বিধাধর আরক্ত, ক্রোধ কুটিলকুচিত; সর্বদা ধর ধর কম্পবান্।

রাজা শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন না। ঋষিকুমারদ্বয় তথায় শকুন্তলাকে

রাধিমা সভাস্থল ত্যাগ করিতে উদ্ভত—আর অনন্তাশ্রয়া—শকুন্তলা কান্নিতে কান্নিতে পশ্চাতে ছুটিতেছে। “দুর্ভ কৰ্ত্তৃক আমি প্রতারিতা হইয়াছি, তোমরাও আমাকে ত্যাগ করিলে?” এইরূপে করুণস্বরে তাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া গৌতমীর রমণী-হৃদয় কান্নিয়া উঠিল। গুরুসম তেজস্বী শিষ্য শাক্যরব শকুন্তলার দিকে ফিরিয়া বখন বলিল, “আঃ অপরাধিনি, এক্ষণে আবার স্বাধীনতা অবলম্বন করিতেছ?”

সেই তপস্বিনী তখন ভীতা ও কল্পিতা। তাহার কর্ণকুহর ভেদ করিয়া শাক্যরবের সেই পরুষবাক্য তখন সভাক্ষেত্র ভীত চকিত করিয়া দিল।—

“শোন তুমি শকুন্তলে, রাজা বাহা বলিতেছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তুমি ত কুলভ্রষ্টা;—তোমাকে লইয়া পিতা কি করিবেন! আর তুমি যদি আপনার কার্য্য পবিত্র বলিয়া মনে কর, তবে তোমার পক্ষে পতিকুলে দাসত্ব করাও ভাল।”

তপস্বীরা চলিয়া গেলেন। শকুন্তলা “রাজ-পুরোহিতের গৃহে প্রসবকাল পর্য্যন্ত থাকিবেন”—ইহাই স্থির রহিল। শকুন্তলা পুরোহিতের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিবার সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। কোথা হইতে এক জ্যোতির্গম্বী স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়াই ক্রন্দনপরা শকুন্তলাকে কোলের উপর তুলিয়া লইয়া নিমেষে অদৃশ হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যে শকুন্তলার অভাবনীয় অঙ্কুরান ঘটিল।

কিম্পূর্ব্ব বর্ষে—হেমকূট পর্ব্বতে—মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রমে পূজ্যসমাজ শকুন্তলা অবস্থিত। বাহার মনে সুখ নাই, স্বর্গে বা ভগোবনে কোথাও তাহার সুখ নাই। শান্তিময় আশ্রমে থাকিয়াও শকুন্তলা বিরহে দীনা, নিরমে কীর্ণ, একঘেণী-ধারিনী। পরিধানে একখানি মলিন বস্ত্র সেই বরষপুষ্প

## কালিদাসের শকুন্তলা

বেঠেন করিয়া আছে যাত্র। শকুন্তলা আজ প্রোথিতভর্তৃকা ; বেশভূষা নাই, শরীর সংস্কার নাই ; মুখখানি কুশ ও পাণ্ডুবর্ণ ; রক্তিম অধর আভাহীন, পাটল-বর্ণ। দৃষ্টি কখনও ভূমিপানে আনত, কখনও বা শূন্য পথে বিক্ষিপ্ত। অন্তরে বাহিরে শকুন্তলা প্রকৃত তপস্বিনী।

দেবকার্য সাধনান্তে—প্রত্যাবর্তনের পথে দুয়ন্ত সেই বিরহকুশা, দীর্ঘত্নতথারিণী শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র চিনিয়া ফেলিলেন। শকুন্তলা কিন্তু অমৃতাপ-বিবর্ণ রাজাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারে নাই। শকুন্তলা বিরহে যতই পরিম্লান বা দুঃখিতা হউক—তথাপি তাহার যাতনা অপেক্ষা দুয়ন্তের যাতনা অধিক। সেই আত্মনিবেদিতা সরলা তপস্বিনীকে সভামধ্যে ব্যাভিচারিণীরূপে দূর করিয়া দেওয়ার যে কি যাতনা—তাহা দুয়ন্তই জানেন। এ যে স্বহস্তে হৃৎপিণ্ডচ্ছেদের অপেক্ষাও ভয়ানক। এ অবমাননা, এ নৃশংসতার যে সাক্ষ্য নাই। দুয়ন্ত এখন দহমান বনস্পতির মত ভিতরে বাহিরে পরিবস্তিত। সে রাজকান্তি অমৃতাপে ও মর্ষবেদনার এমত বিবর্ণ, তাঁহার জীবলোক-পরিবর্তন এমনই অসম্ভব রকমের—শকুন্তলা রাজাকে দেখিবামাত্র চিনিতেই পারিল না। পুত্র মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল—“মা, ইনি আমাকে পুত্রের মত আলিঙ্গন করিতেছেন কেন?”

এত দিনের পর দৈব কি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন; আৰ্য্যপুত্রের কি অভাগিণী শকুন্তলার স্মৃতি এখন জাগিয়া উঠিয়াছে? সতীনারী এই শুভাদৃষ্টকে বরণ করিয়া লইবার জন্তই আজ নিয়মবতী ও ব্রতধারিণী।

তখন শকুন্তলা সহর্ষে বাস্পগদগদ-কণ্ঠে “জয়তি জয়তি আৰ্য্যপুত্র” বলিয়া প্রিয়তমকে অভিনন্দিত করিল। নিরতিমানিতাই আদর্শ প্রেমের লক্ষণ। এত বড় অপমান, এত বড় লজ্জা ও এত বড় লালনার পর গদগদ কণ্ঠে জয় ঘোষণা করা আদর্শ নিরতিমানিতারই সূচক। অপ্রমে থাকিয়া

শকুন্তলা হিরা, ধোঁরা ও নিয়ম-সংবত্তা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর সে এখন পুত্রের জননী। পুত্রের উপস্থিতিতে সখীস্বয়ের সমক্ষে কথক্ৰিৎ ধৈর্য্যাবলম্বিনী।

“মা, ইনি কে?” সন্তান মাতাকে আবার প্রশ্ন করিল। জননী উত্তর করিল, “ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর?—যে ভাগ্য আজ আমাকে এই অবস্থায় উপনীতা করিয়াছে, আজ আবার যে ভাগ্য আর্ধ্যপুত্রকে অচিন্তনীয়রূপে এই অপূর্ব্বহানে আনিয়া দিয়াছে, সেই ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।

শকুন্তলার বড় ইচ্ছা, জানিয়া লয়—কেমন করিয়া সে আর্ধ্যপুত্রের স্নরণে আসিল। রাজা তখন শকুন্তলার চক্ষু কোণলগ্ন অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন। শকুন্তলাকে অভিজ্ঞান-স্বরূপ সেই অঙ্গুরীয়টী প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন—

“ঋতু সমাগমের চিহ্নস্বরূপ কুসুমটীকে লতা আবার ধারণ করুক।” কুসুমটী এখানে অঙ্গুরীয়, লতা শকুন্তলা। শকুন্তলা সে অঙ্গুরীয় লইল না! যে অঙ্গুরীয় তাহাকে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহাকে আর বিশ্বাস নাই। প্রিয়তমের স্মৃতিচিহ্ন প্রিয়তমের নিকটেই থাক্। বাহু-স্মৃতিচিহ্নে আর তাহার আবশ্যক নাই।

পতির সহিত মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রমে যাইতেও আজ শকুন্তলার লজ্জা। সে এখন পতিপার্শ্বে নববধূর মতই আপনাকে মনে করিতেছে। অবস্থার পরিবর্তনে মানবপ্রকৃতির পারবর্তন। মহর্ষি কাশ্যপ তখন (শকুন্তলার কর্তব্যচ্যুতির কল-স্বরূপে) দুর্কাসার শাপের কথা হৃদয়ন্তকে জানাইলেন।

শকুন্তলার চিত্তে আর কোন ব্যথাই রহিল না। তাহার মনে হইল, ভাগ্যবশত আর্ধ্যপুত্রকে অকারণ ধর্ম্মপন্থী-পরিভ্রাণী হইতে হইল না,

## মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী

এত বড় নিন্দা হইতে আৰ্য্যপুত্র বে নিৰ্ভুক্ত হইলেন,—ইহাতেই সতীর আনন্দ। এত বে ছুঃখ গেল, তাহার জন্য আৰ্য্যপুত্র অহুযোগী নহেন, ইহাতেই পতিরতার তৃপ্তি। পতিকে কেহ লজ্জা দিবে না, প্রেমহীন ও নির্দয় ভাবিবে না—ইহা পতিপ্রাণার বড় রকমের সাহসনা। ঋষি ছর্কাসা কখন বে শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য শকুন্তলা মনে করিতে পারিল না।

শকুন্তলার পুত্রটী মারীচের আশ্রমে প্রসূত। সেই স্থানে মহর্ষি কর্তৃক যথাশাস্ত্র কত্রিয়সংস্কার-প্রাপ্ত। এই পুত্রটীর নামকরণ হইয়াছে ভরত। তারপর হুয়ন্ত মহর্ষি মারীচ ও দাক্ষায়ণী অদিতির আলীকাদটীকে রক্ত-কবচের মত গ্রহণ করিয়া দেবরাজের আকাশবিহারী রথে আরুঢ় হইয়া স্ত্রী-পুত্র সহ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজাগণ শকুন্তলাকে শ্রদ্ধার মত, পুত্রটীকে বিত্তের মত, রাজা হুয়ন্তকে বিধির মত অভিনন্দিত করিয়া লইল।

পতিবিরহিণী সীতা বাল্মীকি আশ্রমে, প্রোষিতভর্তৃকা শকুন্তলা মারীচ আশ্রমে। ছই জনেই বিরহে দীনা, ক্ষীণা ও পরিস্রানা—আতপ-তাপ-তপ্তা বল্লীর মত শোচনীয় অবস্থার উপনীতা। প্রিয়সমাগমে আবার উভয়েই বায়ুকম্পিতা লতাটীর মত আন্দোলিতা।

কালিদাসের বিরহিণী শকুন্তলার চিত্র, আর ভবভূতির বিরহিণী সীতার চিত্র সকল বিষয়ে ঠিক একরূপ নহে। বাল্মীকির সীতার তুলনার ভবভূতির সীতা ভিন্নরূপ। ভবভূতি নিজের চিত্রিতা সীতাটিকে বাল্মীকির সীতা অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর করিতে পারিয়াছেন বলা যায় না। কিন্তু কালিদাস বে পুরাণ-চিত্রিতা শকুন্তলা অপেক্ষা আপনার শকুন্তলার চিত্রটি অধিকতর সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।



## মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী

( চরিত্র সমালোচনা )

মহাশ্বেতা সঙ্কটের শুভমূর্তি, কাদম্বরী রজোগুণের গৌরাকৃতি । একটা তপোবনের অধিদেবতা, অপরটি সাম্রাজ্যের রাজলক্ষ্মী । প্রথমটী স্বর্গগঙ্গা মন্ডাকিনী যেন আকাশ পথ বহিয়া মর্ত্যে অবতীর্ণা । অল্পট গিরিতটিনী যেন পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া সমতল ভূমিতে বহমানা । মহাশ্বেতা ঋষি-কুমার পুণ্ডরীকের অম্বরাগিনী, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী । কাদম্বরী রাজপুত্র চক্রাপীড়ে দত্তহৃদয়া, রাজার রাজরানী । এটি শাস্তির বিমল খেতিমা । ওটি ভোগের উজ্জল রক্তিমা । একজন আদর্শ দেবী প্রতিমা । অল্পজন-পরীক্ষণী মানবী ছবি ।

### মহাশ্বেতা

মহাশ্বেতা একাধারে ভালবাসার, সংযমের ও ত্যাগের সজীব চিত্র । দর্শনমাত্রই যে সে আপনার প্রাণ মন, ঋষিকুমার পুণ্ডরীকের পদে পুষ্পাঞ্জলিরূপে দান করিল, এ ভালবাসার ছবি ।

মধুকরীর মত আকৃষ্টা হইয়াও যে, সে কত কষ্টে আপনার দুর্দমনীর চিত্তটিকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল, এ সংযমের মূর্তি । সর্বস্বখে জলাঞ্জলি দিয়া একাকিনী নির্জনারণ্যে সে যে পতি-দেবতার জন্ত কঠোর তপস্তার আশ্রয়নিয়োগ করিল—এ ত্যাগের চিত্র । রাজকন্যা হইয়া সে যে ভাবে দিতামাতা আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনীর মত সতীব্রত পালন করিতেছিল, প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যাবন্দনা, শিবারাধনা করতঃ সে যে প্রকারে বনজাত ফলমূলে কোন মতে ক্ষুধিবৃত্তি করিয়া অতি দীর্ঘ দিনগুলি

## মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী

কাটাইয়া দিতেছিল—তাহা সাধারণ মানবীতে হ্রস্বভ, একমাত্র মহাশ্বেতাতেই স্থলভ ।

চন্দ্রাপীড়ের নিকট জীবন ইতিহাস বিবৃত করার এবং রাজপুত্রের স্বপ্নাবোগ্য আতিথ্যসংকার করায় মহাশ্বেতার সংঘম, আতিথেয়তা ও মহানুভবতার ভাবই পরিস্ফুট । বিবাহের অহুরোধ করিয়া মদলেখাকে কাদম্বরীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়ার, দেবারাধনা ত্যাগ করতঃ চন্দ্রাপীড়কে লইয়া কাদম্বরী ভবনে যাত্রা করায় তাহার স্বার্থত্যাগ, সখিপ্রেম এবং সাংসারিক হৃদয়জ্ঞানই সুপরিস্ফুট ।

কি প্রেমে, কি বিরহে, ত্যাগের ভাব বাহার ফুটে, তাহারই প্রেম আদর্শ, সেই মর্ত্যের দেবতা । বাহার না ফুটে, তাহার প্রেম স্বার্থপরতাপূর্ণ, সকাঁম, সে “রক্তমাংসময়-হৃদয়সমবিত” মর্ত্যের মানব মাত্র । মহাশ্বেতা কপিঞ্জলের অহুরোধে ঋষিকুমারের জীবনরক্ষার জন্তই তাহাকে দেখিতে যায়, আশ্রয়স্থির জন্ত, ভালবাসার খেলা খেলিবার জন্ত বা প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার জন্ত মহাশ্বেতা যায় নাই । নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিবে, সর্বস্বত্বে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রহ্মচারিণী সাজিবে, তথাপি সে কুলকল্লার অহুচিত অভিসারিকার বেগে পুণ্ডরীককে দেখিতে বাইবে না । তুচ্ছ নিন্দার ভয়ে, সেই মহাপ্রাণের জীবনরক্ষায় উদাসীন থাকা উচিত নহে,—এইরূপ ভাবিয়াই মহাশ্বেতা মৃতপ্রায় পুণ্ডরীকের দর্শনে যাত্রা করে । আত্মোৎসর্গমূলক প্রেমই আদর্শ প্রেম । এই নিঃস্বার্থ ভালবাসাই মর্ত্যের অমৃত । মরিলে সকলই ফুরায় ; মহাশ্বেতার মরণে ভয় নাই । তথাপি ধৈর্যশালিনী নারী দৈববাণীর উপর নির্ভর করিয়া পুণ্ডরীকের জীবন প্রত্যাশায় ‘হৃদয়-কুহুমশোভা’ দীর্ঘ শোকের মধ্যে কোনমতে জীবনটি ধরিয়া রাখিল ; এ একপ্রকার আশ্রয়-বলি । এ বিরহও সংসারের শক্তি । মহাশ্বেতা সরস্বতীদেবীরই বেন

প্রতিচ্ছবি। বীণাবাদিনী, রাজকন্যা হইয়াও বিষমছুরাগিণী। সংস্কৃত-  
সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। কবি বাণভট্টের ইহা এক অপূর্ণ সৃষ্টি।  
শ্রেমবিহ্বলতার ও বিচারশক্তির এমন বিচিত্র সমাবেশ মুকুন্দায়িকার কদাচ  
দৃষ্ট হয়। এ চরিত্র যেমন শিরীষকুম্ভমবৎ স্বকুমার, তদ্রূপ প্রেমবৎ  
কঠিন। এ বেন ভোগের মধ্যে ত্যাগ, কামনার মধ্যে নিবৃত্তি, সংসারের  
মধ্যে গোলক। সন্তময়ী, খেতবর্ণী মহাশেতাকে ব্রাহ্মণকুমার পুণ্ডরীকের  
অমুরাগিণী করার কবির স্তম্ভ কলা কোশলই প্রকাশিত হইয়াছে।  
“কাদম্বরী” কাব্যে মহাশেতা উপনায়িকা হইলেও তাহার স্থান কাদম্বরী  
অপেক্ষা উচ্চে।

### কাদম্বরী।

কাদম্বরী প্রেমের ও ভোগের শ্রীবন্ত সৃষ্টি। যুবতীর রূপোন্মাদ,  
ঋণাহুরাগিতা ও বীরশ্রিয়তার সঙ্গে শ্রেমবিহ্বলতা বোল আনাই তাহাতে  
বিভবান। মহাশেতার বৈধব্যপ্রায় অবস্থা দেখিয়া সখি-প্রেমবশতই সে  
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ‘বিবাহ করিবে না’। কিন্তু প্রতিজ্ঞা সে রাখিতে  
পারিল না। চন্দ্রাপীড়ের দর্শন-মাত্র তাহার চিত্তে পূর্বরাগের সূচনা হইল।  
চন্দ্রাপীড়ের রমণী-মনোমোহন রূপ, অলোকসান্নাত গুণ, অদৃষ্টপূর্ব মহামু-  
ত্তবতা, শিকারাজিত বাক্-কোশল সেই পূর্বরাগটিকে গাঢ় অমুরাগে  
পরিণত করিল। ইহা নারক চন্দ্রাপীড়েরই চরিতোৎকর্ষতার নিদর্শন।

কাদম্বরী রজোগুণের সৃষ্টি। তাই সে গোহিত-বর্ণা। নবোদিত  
বালসুখের মত তাহার বর্ণ। এ সৌন্দর্য্য “দীপমালায় সমুজ্জ্বল নাউশালার  
মত যুবজন-প্রিয়”।

কাদম্বরী সুরার নাম। সুরার মতই ইহার ঢল ঢল লাবণ্য, সুরার  
মতই ইহার ভীত মাদকতা। ইহার বাক্যে, ইহার অঙ্গভঙ্গিতে, ইহার

## সহ্যস্বেতা ও কাদম্বরী

পদক্ষেপে যেন স্ত্রীর স্রোতই বহিতে থাকে। রম্যোত্তমের অধিবেশতা বলিয়াই কাদম্বরী রাজপুত্রের অনুরাগিনী। চতুরা রাজলক্ষ্মী রাজারই ভোগ্য হইয়া থাকে। বাহুবীতে “প্রভাতরলজ্যোতির” সম্ভাবনা নাই বলিয়াই কাদম্বরী গন্ধর্বাঙ্গরার সহযোগে উদ্ধৃতা। পিতা ‘চিত্ররথ’ গন্ধর্ব, মাতা ‘মদিন্না’ অঙ্গরা। কাদম্বরীর বাগ্‌ভঙ্গী, কলাকৌশল, প্রণয়চাতুর্য্য ও যৌবনলীলা প্রভৃতি ভারতললনার উপযোগী হইবে না—তাই হুম্মদর্শী কবি ইহার দোহে গন্ধর্বাঙ্গর রক্ত বহাইয়াছেন। এ যেন স্বাধীনতা-প্রাপ্তা যৌবনবিলাসিনী পাশ্চাত্য দেশের নারিক।

প্রকৃতির সেবা করিয়া, ভোগের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া নিবৃত্তি-মার্গের পথিক হওয়া যায় না। হাব, ভাব, বিলাস, বিদ্রোহ অঙ্গ ভাঙ্গাইয়া স্রুতুর সখীদের সঙ্গে আবার কুহুমের প্রেমলীলা করিয়া ত্যাগব্রত গ্রহণ করা চলে না। কাদম্বরীর হইল তাই। সেই সৌন্দর্য্যময় পুশ্পরময় অন্তঃপুরে যে বাস করে, “মৃণালিকে”, “কদলিকে”, “কুমুদিকে,” “চূত-কলিকে” দিনরাত্রি এই রহস্তালাপে যে ডুবিয়া থাকে, অলঙ্কক-রসও চরণের ভার, বিনা হস্তাবলম্বনে উত্থানও সাহসের কাজ,—এমন বিলাসের ভাবে যে অল্পপ্রাণিত রহে—তাহার আবার প্রতিজ্ঞা, তাহার আবার ত্যাগ! এই প্রকার লালসারাগে আপাদ-মস্তক অনুরক্তিতা বলিয়াই কাদম্বরী চম্পাপীড়কে দর্শনমাত্র ভালবাসার মুগ্ধ হয়। নহিলে কি তাহার চম্পু চম্পাপীড়ের দর্শনমাত্র—একেবারেই “নিশ্চল নিবন্ধ-লক্ষ্য” হইয়া পড়ে? সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চ, কল্পন, স্বপ্নদ্বারা ও নিখাস-বুদ্ধি কখন কি দেখা যায়? আশ্চর্য্য, কাদম্বরীর এই সহসা ভাবান্তর! চম্পাপীড়কে দর্শনমাত্র মুগ্ধের সেই স্নিগ্ধহাস, নয়নের সেই মুগ্ধ-কটাক, সারা অঙ্গের সেই লজ্জার লীলা, একটী দ্রুত সেই উদ্ভাসিত মুখ ভঙ্গিমা—এ সকল যেন কেবল কাদম্বরীরই বিশেষত্ব। এ যেন উদ্ভাস প্রেরণের গৈরিক নিয়াম,

উদ্ভাসক বোবনের বিপুল উজ্জ্বল, সন্তোষাঙ্কক আদি-রসের চরম বিকাশ।

হৃদয়স্তর প্রথম দর্শনে শকুন্তলার মনে হয়—“ইহাকে দেখিয়া আমার মনে তপোবন-বিরোধী ভাবের উদয় হইতেছে কেন?” আর চন্দ্রাপীড়ের প্রথম দর্শনেই কাদম্বরীর রোমোদগম, উরুকম্প, শ্বেদনির্গম ও উকলয়ত নিখাস দেখা গেল। শকুন্তলার হৃদয়ে অহুরাগের বীজটি প্রথমে ফুটিয়া উঠিয়া ক্রমে অকুরিত, পরিশেষে ফুল ফলে শোভা পায়, আর কাদম্বরীর চিত্তে প্রণয়কুহুম একেবারে বিকশিত হইয়াই যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। শকুন্তলার প্রণয়-নদী পর্বতবক্ষে জন্ম লইয়া ক্রমে বিপুলকারা প্রধরপ্রোতা হইয়া দেখা দেয়; আর কাদম্বরীর প্রেমনদী একেবারেই বিশালোদগ্ধা ধরতরঙ্গা হইয়া পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া ছুটিয়াছে। নির্ঝিলাস তপোবনের মধ্যে, শমাব্বিত ঋষিগণের মধ্যে বাস করিয়া শকুন্তলার পূর্বরাগ যেমন ভাবে ফুটিয়া উঠে, বিলাসময় কুমারী পুরে—হাবভাবময়ী সখীদের সংসর্গে থাকিয়া কাদম্বরীর পূর্বরাগও যে সেইভাবে ফুটিবে, এমন কথা নাই। তুলনার বলা বায়, মহাশ্বেতার পূর্বরাগ শাস্ত উদ্ভীর নর্জন, শকুন্তলার পূর্বরাগ ধরতরঙ্গের উজ্জ্বল, আর কাদম্বরীর পূর্বরাগ উদ্ভাস কজ্জলের গর্জন।

## মহাশ্বেতা।

মহাশ্বেতার শৈশবজীবনের চিত্রটি বড় মধুর। গুরুর্কগণের অকে অকে বীণার মত আকর্ষণ থাকিয়া, পিতামাতার আদরে স্নেহে তাহার বাল্যকাল বড়ই সুখে কাটিয়াছিল। তারপর নববোবনের আবির্ভাব, সেও বড় মধুর। চরণের লীলাঙ্কিত গতি, চকুর শাস্ত কটাক, কপোলের আশ্রিত আভা জাহাকে বড়ই প্রিয়দর্শনী করিয়াছিল; নববোবনের সমাগমে

## মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী

নবপল্লব-বোটিত কুমুদটির মত তাহার একটি নূতন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এমনই এক বসন্তকালের মধুমাসে মধুসুখা কামদেবের মতই মধুর-দর্শন পুণ্ডরীক কপিঞ্জল সহ তাহার সম্মুখে আসিল। স্বর্গের পারিজাত মঞ্জরীর গন্ধ, ঋষিকুমারের পবিত্র সুন্দর স্রী, অনির্বচনীয় তপোভোজি তাহার উপর একটি প্রভাবের বিস্তার করিল। সেই ঋষিকুমার মহাশ্বেতাকে দেখিলামাত্র মোহিত হইয়া তৎপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ভালবাসার নিদর্শনরূপে সেই ঋষিকুমার মহাশ্বেতার কর্ণে স্বর্গের পারিজাত মঞ্জরী বাঁধিয়া দিল। উভয়েই উভয়ের দর্শনে মোহিত ও অধুরক্ত হইয়া পড়িল।

মহাশ্বেতা আপনার প্রাণ মন ঋষিকুমারের পদে পুষ্পাজলরূপে স্থান করিয়া মাতার সঙ্গে কোনমতে গৃহে ফিরিল। চরণ আর চলে না, দেহভার আর বহে না, পায়ের নৃপুরগুলি পর্যন্ত মঞ্জীর-শব্দে মহাশ্বেতার প্রত্যাগমনে বারণ করিতেছিল। নবপ্রেম-রাগে আপাদ-মস্তক অধুরঞ্জিতা কুমারী তখন অলস দেহবাটী শয্যার উৎসঙ্গে চালিয়া দিল। তরলিকার মুখে ব্রাহ্মকুমারের আকুলতার নিবেদনটি মহাশ্বেতা আদর করিয়াই শুনিла। তারপর পুণ্ডরীকের সখা কপিঞ্জল আসিয়া প্রিয়তমের ছবিটি মহাশ্বেতার চক্ষুর উপর ধরিল। তাহারই জন্ত ঋষিকুমার মৃত্যুশয্যার শয়ান, জীবনরক্ষার মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র তাহারই আশ্রয়ে। মহাশ্বেতার উভরসঙ্কট, তরলিকাকে সে কহিল, “সখি কি করিব? পিতামাতা আত্মীয় বন্ধুদের না জানাইরা, ইতর রমণীর মত প্রণয়ীর নিম্নে ফুটিয়া বাইব? কুলমর্যাদা লগাচাক্সের মস্তকে পরাধাত করিয়া নিম্নজ্ঞার মত অভিলার করিব? আবার এদিকে ব্রহ্মহত্যা গুহিহত্যার পাতকিনীই বা কিরূপে হইব?”

তরলিকার অসুস্থতা, “বাগুয়াই উচিত।” তখন সেই কুলকুমারী তরলিকাকে সঙ্গে লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিল। দেখিল—পুণ্ডরীকের “নিশ্চলতারক”—চক্ষু দুইটি চক্ষুলাল্যে স্থির। বাহু দুইটি নিশ্চলহৃদয়ের উপর অসাড়ভাবে নিপতিত। অভাগিনী বুঝিল—তাহার বড় আশার ইলেক্ট্রিক কালমেবে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বসন্তের বাতাসে জীব-কুমুদটা ফুটিতে না ফুটিতে গ্রীষ্মের খবতাপে ঝলসিয়া গিয়াছে।

দেববাণী হইল, “পুণ্ডরীক আবার বাঁচিবে।” যে মহাপ্রাণ অভাগীর জন্ত অতৃপ্ত মনপ্রাণ লইয়া মহাযাত্রা করিয়াছে—তাহারই জন্ত মহাশেষতার বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। দেব-নিবেদিত সে তছুটিকে যে রকম করিয়াই হউক, ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। নিজের সুখের অপেক্ষা প্রেমাপদের সুখই বেহানে অধিকতর কাজিত, প্রকৃত প্রেম সেইস্থানেই।

তারপর মহাশেষতার যোগিনীবেশ। আদ্র বহলে যৌবনের মাধুরী ঢাকিয়া, সোনার অঙ্গে বিভূতি মাখিয়া, রাজকুমারী একাকিনী অরণ্যে নিবাসাধনার নিযুক্তা। মহাশেষতা বখন গভীর রজনীতে বীণা বাজাইয়া করুণ সঙ্গীত গাহিত, বনদেবীরা পর্যন্ত পাণ্ডুপত্র ঘোচন করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিত; লোকে ভাবিত, ভগবতী পশুপতির প্রেমরতা লাভের আশার তপস্কার্য আবির্ভূতা।

কদম্ববলে মহাশেষতা অধিষ্ঠিত। কতদিন কত বৎসর একই ভাবে কাটিয়া গেল। পুণ্ডরীক পরজন্মে বৈশম্পায়ন হইয়া মহাশেষতাকে দেখিয়া উন্নতের মত একদিন আশ্রয়ে উপস্থিত। আমাদের দর্শনশাস্ত্র মতে “উদ্বোধের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্মান্তরের স্মৃতি ফুটিয়া থাকে।” সেই জন্মান্তরের অতৃপ্ত ভোগ-লালসা আজ শত-বাহু হইয়া তাহাকে বেঁটন করিল। উপেক্ষা ও উদ্বাসীভূত পাইয়াও সে লালসার অগ্নি নির্বাপন

## মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী

প্রাপ্ত হইল না। সেই উন্নত কারুক একদিন গভীর রজনীতে হৃষ্টা মহাশ্বেতার অঙ্গস্পর্শ করিবার জন্য অগ্রসর হইল—তপঃক্লশা নিরমবতী সাক্ষীর সতীত্বের ভেঙ্গে তার পাপদেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। সতী-শাপে বৈশম্পায়ন ভস্মীভূত হইয়া পক্ষিবানি প্রাপ্ত হইল। সেই হৃষ্টিও কিছুকাল বরণা ভোগের পর শেষ হইয়া আসিল।

ভোগেই কর্ণের ক্ষয়। পুণ্ডরীকও সশরীরে মহাশ্বেতার নিকট উপস্থিত। এমন কঠোর সাধনা কখন বৈকল্যকে বরণ করে না।

বে কপিঞ্জল পুণ্ডরীকের আসক্তিকে পাপ মনে করিয়া মহাশ্বেতাকে পাশিষ্ঠা মায়াবিনী বলিয়া গালি দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই কপিঞ্জলই আজ মহাশ্বেতাকে আদর্শ সাধবী দেবী বলিয়া পূজা করিল। বে প্রেম লোহনুজ্বলের মত কষ্টকর বন্ধন মনে হইরাছিল, তাহাই আবার জীবনের বন্ধনী হইয়া উঠিল।

(২)

## কাদম্বরী।

কাদম্বরী ভোগময়ী প্রকৃতির সৃষ্টি, সংসারের নানাবর্ণময়ী চিত্রশালা। কাদম্বরী বেন শৈশবের কলিকারূপে না ফুটিয়া একেবারেই প্রস্ফুটিত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, জীবনাকাশে যৌবনের পূর্ণচন্দ্র বেন মধ্যস্থলে একেবারে উদ্ভিত হইরাছে। কাদম্বরীকে বখন আমরা প্রথম দেখিতে পাই, তখন সে গন্ধর্ব্বনগরীর কুমারীপুরে—বিলাসিনী সখীদের মধ্যে বিলাস-লভ্যার শরানা। তাহার বাসবাটিকা বেন স্বর্গের অমরাবতী। সেখানে বিদ্যাতের হিরণ্যতা দিবারাত্রই জলে, ফুটন্ত জ্যোৎস্নার রশ্মি নিরন্তরই ফুটে, মলয়ের সুহৃৎক বাতাস সর্ব্বকথাই বলে। সেখানে রূপসীরা কপের ডালি লইয়া সখীস্ব বিদ্যাজতার স্বক্ বেড়াইয়া বেড়ায়, গন্ধর্ব্বাশ্রয়।



জলনাকুল বীণা বাজাইয়া সঙ্গীত গাহিয়া ভোগস্বৰ্গ সৃষ্টি করে।  
অন্তঃপুরে কোথাও আবীর কুছুমের বৃষ্টি, কোথাও সরসীকূলে জলক্রীড়া,  
কোথাও সম্মিত পল্লব নিকষ, কোথাও বোবন সম্বন্ধীয় বিশ্রুতরসালাপ।  
একদিকে শুক সারিকার প্রণয়কলহ, অপরদিকে মদলেধা ও তমালিকার  
চাটুস্তি; এইরূপে কাদম্বরী সংসার-নদীতে অঙ্গ ভাসাইয়া বহিয়া চলিয়াছে।  
কাদম্বরী যুবক রাজকুমারগণের আরাধ্যা সামগ্রী। এমন বিলাসময়ীকে  
বিলাসসঙ্গিনী করিতে কোন্ বিলাসী না ইচ্ছুক হয়? কাদম্বরী যখন হাঁসে,  
তখন মুক্তা বরে; আলাপ করে, বীণা বাজে; চলিয়া যায়, মৃত্তিকা  
শিহরে। তার প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে আদিরস উছলিয়া পড়ে, প্রতি কটাক্ষ-  
বিক্ষেপে বিছাণের তরঙ্গ বহে; প্রতি রোমকূপে আকাজ্জক খরজ্যোতি  
নিয়তই প্রজ্জ্বলিত রহে।

চন্দ্রাপীড়ের সম্মুখেই প্রথম কাদম্বরীর আবির্ভাব। চন্দ্রাপীড়ের  
অভ্যর্থনা-নিমিত্ত তাহার সেই সভঙ্গীক উত্থান, তাম্বুল প্রদানার্থ সেই  
সংবেদ হ্রস্ব হ্রস্ব কম্প, রূপাতিশয়-দর্শনজন্তু সেই উদ্ভিন্ন রোমাঞ্চ, আর  
প্রথম প্রণয়াবেশ-হেতু সেই সচকিত কটাক্ষ-কাদম্বরীকে বড়ই নয়নাকর্ষক  
ও উন্মাদক করিয়া তুলিয়াছে। কাদম্বরীর একটি ইঙ্গিতে, একটি কটাক্ষে,  
একটি অঙ্গভঙ্গীতে যে ভাব প্রকাশ পায়, সহস্রনারীর প্রেমগর্ভ বাণীতে তাহা  
নাই। অন্তঃপুরিকাগণের হাব ভাব, বিলাস বিভ্রম, ভ্রুভঙ্গী কটাক্ষ, ইঙ্গারা  
ইঙ্গিত, রসালাপ চাটুস্তির মধ্য দিয়া না বাইলে কাদম্বরীকে বোঝা  
যাইবে না।

কাদম্বরী চরিত্রটির আগাগোড়াই কদম্বতত্ত্ব বিশ্লেষণে ভরা। তাহার  
প্রণয়রোগের চিত্রটিতে কি সূক্ষ্মর সত্তাই ফুটান হইয়াছে। কাদম্বরীর শরন,  
উত্থান, রোমাঞ্চ, বেদ, কম্পন ও স্তম্ভ, কি মনোরম ভাবেই কেনাইয়া  
কেনাইয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কুমারীপুং, ক্রীড়া-পর্বত, কুঞ্জবন, মর্ষর-

## মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী

বেদী, চন্দ্রোদয় ও প্রাতঃকালের ছবি কি মনোহররূপেই অঙ্কিত হইয়াছে। কাদম্বরীর সকলই সুন্দর, সকলই উদ্ভাদক, সকলই অপূর্ব। ছলা কলা চাতুরী, আচার ব্যবহার, শিষ্টাচার সভ্যতা সকলই অদ্ভুত, হৃদয়োত্তেজক। প্রণয়ভরসিকা সখীদের সঙ্গে যার নিয়ত সহবাস, প্রেম-গীতির লীলারিত সূক্ষ্মনায় সর্বদা যে বিভোরা, সেই কাদম্বরীই চতুরা, বিলাসিনী, প্রথরবুদ্ধি-মতী না হইবে কেন? কবি বলিয়াছেন “বালা হইয়াও সে মন্থ-জননী।”

‘কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের গোপন প্রণয়লীলা ফলুর মত হৃদয়-বালুকার মধ্য দিয়া বহিয়া চলিল। মধ্যে মধ্যে এক একটি তরঙ্গের উচ্ছ্বাস সেই বালুকা ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এ প্রণয়লীলার বিশেষত্ব,— কাদম্বরী নিজে বড় কোন কথা কহিত না। মনোভাব বুঝিয়া জর মূহু চলনেজিত পাইয়া মদলেখাই যাহা বলিবার বলিত। তাহার বিলাসেজিতে ভাবভঙ্গীতে অবশ্য কিছু কিছু প্রকাশ পাইত মাত্র। প্রণয়ের এই লুকোচুরি খেলা বড়ই উপভোগ্য। এই লুকোচুরি গোপনেই রহিল; কেহ কাহারও নিকট মুখ খুলিল না। এইরূপে আশা নিরাশা, নিশ্চয় সন্দেহ, প্রণয় বিরহ, হর্ষ বিবাদের মধ্য দিয়াই কাদম্বরীর প্রণয় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পিতার পত্র পাইয়া চন্দ্রাপীড়কে অকস্মাৎ রাজধানীতে ফিরিয়া বাইতে হইল। কাদম্বরীর সহিত সাক্ষাতের আর সময় নাই; পত্র পাঠাইয়া কমা প্রার্থনা করিয়া চন্দ্রাপীড় বিদায় শেব করিয়া লইল। বিদায়-দৃষ্ট আর আমাদের দেখা হইল না। ছইজনের মধ্যে আর কাহাকেও মুখ খুলিতে হইল না।

নির্বিলাস তপোবনের মধ্যে থাকিয়া, পিতৃগরবশা হইয়াও শকুন্তলা হৃদয়কে আশ্রয়ান ও দেহদান করিতে বাধ্য হয়, আর বিলাসপূর্ণ কুমারীপুরে বাস করিয়া একপ্রকার স্বাধীনতা-প্রাপ্ত হইয়াও গুরুকাল-  
৩৩

নব্বিনীকে আশ্রয়ান ঘুরে থাক, মৌখিক প্রণয়-প্রকাশ পর্যন্ত করিতে হইল না। চন্দ্রাপীড় যদি পিতার পত্র পাইয়াও কোন ছলে গুরু-পুত্রীতে থাকিয়া বাইত, তাহা হইলে কাদম্বরী কি করিত—সে বিচারে এখন আর আবশ্যক নাই।

চন্দ্রাপীড় চলিয়া যাওয়ার পরে পত্রলেখা কিছুদিন কাদম্বরীর অনুরোধে তাহার নিকট থাকিয়া গেল। কাদম্বরী পত্রলেখার নিকট আপনার অন্তরের কঁকষার খুলিয়া দিল। মহাশ্বেতা জ্যোষ্ঠা ভদ্রীর মত প্রকার পাণ্ডী, 'আর সে এখন বোগিনী সন্ন্যাসিনী; মদলেখা পরিজনের মধ্যে হইলেও হাসী মাত্র। কাদম্বরী হৃদয়ের গোপন বাধা আর কাহাকে জানাইবে? পত্রলেখা চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গিনী, সখী—তাই সে আজ প্রিয়া। আর কাদম্বরীর প্রণয়-কাহিনী চন্দ্রাপীড়ের নিকট গিয়া প্রকাশ করিবে—তাই সে প্রিয়তমা। প্রিয়তমের নিকট এই প্রেম নিবেদন করিয়া কাদম্বরীর মনের ভার লাঘব হইল; প্রণয়িনীর ইহাতেই আশ্বস্তি। পত্রলেখা ভরসা দিল—“আমি পাদপঙ্কজ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, তোমার হৃদয়-হরিভকে আমি সম্বরণই আনিয়া দিব।” মিলনে যে প্রেম গুপ্ত থাকে, বিরহে তাহাই শতমুখে উৎসারিত হয়—ইহাই প্রেমের ধর্ম। পত্রলেখা কিরিয়া গিয়া কাদম্বরীর অবস্থা চন্দ্রাপীড়ের নিকট বিবৃত করিল। কি উদ্ভাসক সে ভালবাসা, কি হৃদয়-বিদারক মর্মবেদনা, কিবা কাতর আকুল আহ্বান!

সকলেই কিরিয়াছে কিন্তু বৈশম্পায়ন কোথার? সে ত কিরে নাই! প্রিতু-আদেশে চন্দ্রাপীড়কে অজ্ঞান-সরসী-তীরে আবার বাজা করিতে হইবে—কি সুখময়ী বাজা সে! কাদম্বরীর প্রণয়লাভ আজ সার্থক হইবে, জীবন্ত প্রোভাতরল জ্যোতি আজ হৃদয়ের উপর হিরভাবে বিরাজ করিবে—কি সুখ সে!

## মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী

বড় সাথে বড় আশার চম্পাপীড় পূৰ্ণগরিচিত অছোদ সরসী-তীরে মহাশ্বেতা আশ্রমে উপস্থিত। একি, বৈশম্পায়ন আর নাই! প্রিয় সখার সেই কমনীর তনু আজ মহাশ্বেতার অভিধানে তন্নীভূত। অকার্য্যকାରী প্রাণপ্রিয় বজ্রের মৃত্যুর জন্ত চম্পাপীড় মহাশ্বেতাকে কিছু বলিল না, কোনও অল্পযোগ করিল না। কি মহানুভবতা, কি সুবিচার, কি আত্মোৎসর্গ!

“দেবী কাদম্বরীর সেবাসুখ লাভ করা এ জন্মে আর হইবে না, জন্মান্তরে যেন লাভ করিতে পাই”—বলিতে বলিতে চম্পাপীড়ের স্বভাবসরস হৃদয় ক্ষুটিত হইয়া গেল।

কবি বলিলেন—“কাদম্বরী-সমাগমাশ্রাণ্ডি-ভ্রুংখেনৈব তেদোন্মুখং মুকুল-মিব স্বভাবসরসং হৃদয়মক্ষুটং।”

এদিকে কাদম্বরী প্রিয়তমের আগমন সংবাদ পাইয়া মহাশ্বেতা আশ্রমে উপস্থিত। হর্ষ, সুখ, মান, অভিমান, উৎকর্ষা, ব্যাকুলতা লইয়া রাজকুমারী হৃদয়-দরিতের দর্শন আশায় প্রধাবিতা—বাইয়া দেখে—তাহার প্রাণপ্রিয় চম্পাপীড় “উৎখাত-বীজকোষ” পণ্ডের মত, কলকুসুমশূন্য উপবনের মত ও চক্রেবিরহিত নিশামুখের মত প্রাণশূন্য নিপাত্ত।

সেই বিলাসিনী যৌবনমদ-মত্তা কাদম্বরীর নিমিষের মধ্যে এক মহা-পরিবর্তন সংঘটিত হইল। নয়নে অশ্রুধারা নাই বরং সহস্রগণের সুদৃঢ় সংকল্পে মুখখানি নির্বিকার ও প্রশান্ত। চম্পাপীড়ের মৃত্যুর জন্ত সখী মহাশ্বেতাকে কারণ ভাবিয়া কাদম্বরী কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ হইল না—মহানুভবতার প্রকৃতিই এই, সখী-প্রেমের অলঙ্ঘ্য নিদর্শনই এই! বাস্তবিক কাদম্বরী-চরিত্রের এইহানেই সর্বোপেক্ষা বিশেষত্ব। পুণ্ডরীককে মৃত দেখিয়া সংযমশীলা মহাশ্বেতার প্রাণভেদী ক্রন্দনে সমস্ত বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে, আর এই যৌবন-বিলাসিনী কাদম্বরী প্রিয়তমের মরণে ক্রন্দন করিল না—বরং সহস্রগণে ক্ষুটিত হইয়া রহিল।

রঘুবংশে—অজরাঙ্কার, কুমারসম্ভবে—রতিদেবীর, উত্তর-চরিতে—  
রামচন্দ্রের, নৈষধ-চরিতে—স্বর্ষ হংসের বিলাপ অনেকেই শুনিয়াছেন,  
আর আলি কাদম্বরীর বিলাপ শুনুন। সহমরণে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া কাদম্বরী  
মন্ডলেখাকে বাহা বলিয়া গেল—যেমন স্বাভাবিক, তেমনই কবিত্বময়,  
তেমনই মর্শ্ব-বিদারক।

“সখি, বাবা মা রহিলেন, দেখিও। আমি বাহাকে বে চক্ষুতে  
দেখিভাম, তুমি তাহাকে সেই মতই দেখিও। \* \* \* আমার চরণ-  
তললালিত—অশোক তরুটির পত্র পল্লব, দেখিও, যেন কেহ কর্ণপূর  
করিবার জন্ত না ছেঁড়ে ; সহকার তরুটির সাথে আমার সেই বড় সাধে  
রোপিতা মাধবী লতাটির বিবাহ দিও। আমার গৃহস্ত-বন্ধিতা মালতীলতা,  
কুসুমিতা হইলে তাহার ফুল দিয়া যেন কেবল দেব-পূজাই করা হয়।  
“কালিন্দী” সারিকা, “পরিহাস” গুণটিকে পিঞ্জর বন্ধন হইতে মুক্ত  
করিও—তাহারা বেধানে ইচ্ছা উড়িয়া যাক। সেই নকুলিকাকে  
(বেলী) ক্রোড়ের উপর করিয়া নিদ্রা যাইও। সেই জীবজীব মিথুন,  
সেই হংস দম্পতির যেন কোন বিপদ না ঘটে। সেই ক্রীড়াপক্ষত,  
বাহাকে ইচ্ছা দান করিও, আর সেই বীণাটী, তুমি নিজে  
বাজাইও।”

মহাশ্বেতার নিকট গিয়া তাহার কণ্ঠ ধরিয়া বলিতে লাগিল—“প্রিয়  
সখী, তোমার প্রত্যাশা আছে, তাই তুমি মরণের অধিক যত্নগা সহ্য  
করিয়া সন্মারগের আশার বাঁচিয়া আছ। আমি কি লইয়া বাঁচিয়া  
থাকিব ? অন্তরে যেন আবীর তোমাকে প্রিয়সখী-রূপে পাই।”

তারপর কাদম্বরী প্রিয়তম চন্দ্রাপীড়ের দেহের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া  
রহিল। সেই নিম্পল দেহের শীতল স্পর্শে—আজ এই সাংঘাতিক  
মুহুর্তেও তাহার দেহে পুলক ফুটিয়া উঠিল। তখন সেই উন্মাদিনী

## মহাশ্বেতা ও কাদম্বরী

বালা আপনার শিখিলকবরী-চ্যুত পুষ্পরাশি দিয়া পতিপদ পূজা করিল ; ধীরে ধীরে সে চরণ ক্রোড়ের উপর তুলিয়া লইয়া স্তম্ভিতাবৎ বসিয়া রহিল। বড় আনন্দময়ী, বড় চতুরা, বড় বুদ্ধিমতী যে, আবাল্য হৃৎখ সহনে অনভ্যস্তা যে, সেই নারীর কি এই শোক-মূর্তি? শোকে এমন ছিন্না, দৃঢ়া, মরণে এমন কৃতসংকল্পা সতী নারীর দৃষ্ট সংস্কৃত সাহিত্যে ফলভ নহে। বাঙ্গালার কবি কি এই দৃষ্টটিই মৃণালিনী উপত্যাসে মনোরমার সহমরণ কালে ফুটাইয়াছেন?

কাদম্বরীর স্পর্শে “সমুচ্ছৃসিতাদিব দেহাৎ” প্রিয় দেহ হইতে এক “চন্দ্রাবল” জ্যোতি উর্দ্ধে উষিত হইল। দৈববাণী শোনা গেল—“চন্দ্রাপীড়ের পুনর্জীবন লাভ হইবে”।

নির্বাণোন্মুখ দীপশিখাটি তৈলবিন্দু পাইয়া জলিয়া উঠিল। শুষ্কপ্রায় মাধবীলতাটি বর্ষার বারিদেকে পুনরুজ্জীবিত হইল। কাদম্বরী-স্পর্শে সে দেহ অবিকৃত থাকিবে, একদিন চন্দ্রাপীড়ের দেহে জীবন ফিরিয়া আসিবে—এই বিশ্বাসে সে শিখিলবৃন্ত কুম্ভমবৎ আপনার জীব-কুম্ভমটিকে কোন মতে ধরিয়া রাখিল। সেই ভোগময়ী প্রকৃতি আজ নিবৃত্তিরূপা হইয়া মহাশ্বেতার মতই বাঁচিয়া রহিল।

মহাশ্বেতা-প্রিয় দেহ পায় নাই, কাদম্বরী প্রিয় দেহ পাইয়াছে— কাজেই সে মহাশ্বেতার মত বীণা বাজাইয়া, শিবারাধনা করিয়া, প্রিয় স্মৃতিচিহ্ন লইয়া জীবন কাটাইবে কেন? সে যে প্রিয়তমের স্পৃহনীয় দেহটী তাহারই সৌভাগ্য দেবতার বরে লাভ করিয়াছে। তাই সে বড় বড়ে সেই প্রিয়তম-দেহ চন্দন-চর্চিত করিয়া, বিঘ্ন বিপদ হইতে রক্ষা করে। সে জীবন্ত হইয়া ঐ অবলম্বনটী লইয়া বাঁচিয়া রহিল; মহাশ্বেতার মত বীণা বাজাইয়া, প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া, বনের ফুল তুলিয়া মহাদেবের পূজা অর্চনা লইয়া থাকিতে পারে না। ঐ জাতীয় সংঘম শক্তি

তাহার নাই। গাছ তাপে অভঙ্গ। জলনলিনীর মত সে মুখখানি লুকাইয়া রাখিতেই ভালবাসে। বাহার বাহা প্রকৃতি।

অভিশাপের শেষ দিন। বসন্তকালে পূর্ণিমার শেষ রজনীতে মলয় পথনের শিহরণে শিহরিয়া উঠিয়া কাদবরী উন্নততার মত চম্পাপীড়কে অকস্মাৎ একদিন আলিঙ্গন করিল। সেই মৃতসঞ্জীবন-স্পর্শেই যেন সেই মৃতদেহ সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। চম্পাপীড় চাহিয়া দেখিল, কাদবরী উন্মাদক আলিঙ্গনে তাহাকে বাধিয়া রাখিয়াছে।

চারিটি অতৃপ্ত প্রাণীর মুখে তখন মিলনের স্বচ্ছ হাসি—কি সুন্দর দৃশ্য! বিবাদের করুণ সঙ্গীতের পর মিলনের এ সুখ রাগিনী—বড় আতি-সুভগ! ইহা প্রাণ-ঢালা ভালবাসারই পুরস্কার, প্রাণপাত সাধনার ফল। ইহা মহত্বের জয়, ধর্মের মাহাত্ম্য।



# দ্বিতীয় খণ্ড

## উত্তর-রামচরিত

### ( প্রথম অঙ্ক )

উত্তররামচরিত নাটক ভবভূতি কবির গৌরবের মঞ্চর প্রাসাদ । সংস্কৃত নাট্যাকাশে ইহা ষোলকলা শশধর । সকলরসে সৰ্ব্ববিধভাবে এ তটিনী সৰ্ব্বদাই কানায় কানায় পরিপূর্ণ । করুণ-রসে ইহা মধুর, রোদ্র-রসে ইহা উৎকর্ষ । রামচন্দ্রের জীবনের প্রথমভাগ—মহাবীর-চরিতে, উত্তর অর্থাৎ শেষভাগ—এই উত্তররামচরিতে বর্ণিত ।

নাট্যকলাবিচারে কালিদাসের “অভিজ্ঞান শকুন্তলের” পরই ইহার স্থান । অভিনয়ে এই নাটক শ্রোতৃগণের হৃদয়ে ঝটিতি প্রভাব বিস্তার করে । অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসনে—ইহা “বিপ্রলভ করুণাখ্য” আদিরসের অন্তর্গত নাটক । রসের অনুযায়ী ভাবা-বিশ্রাসে, অক্ষর-সন্নিবেশে ইহার তুলনা নাই । শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক শেষ হইয়াছে । স্ত্রীও বিভীষণাদি বন্ধুরা, নানা প্রদেশের নরপতিরা, ব্রাহ্মণ, মুনি ও বেদাবৎ ব্রাহ্মণেরা সে অভিষেকোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ; অভিষেক শেষ হওয়ার তাঁহারা নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন । উৎসব-কোলাহলে মুখরিত—অবোধ্যানগরী যেন এখন মুক ; তরঙ্গোচ্ছাসে টলমল—রাজধানী যেন এখন সৈকত-ভূমির অবস্থায় উপনীত । বীরবৃন্দের জয়োল্লাস নাই, রাক্ষস বানরের তাণ্ডব নৃত্য নাই ; বীরবৃন্দের পদতরে নগরীর পথ আর কল্পিত হয় না । এইস্থান হইতেই নাটকের আরম্ভ ।

রাজমহিষী সীতাদেবীর পিতা “সীরধ্বজ” জনক, রাজা হইয়া রাজর্ষি, আহিত্যগ্নি ও বাগশীল । বাজবল্য-শিষ্য, উপনিষদের জনক রাজার ইনি বংশধর, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির তুল্যরূপই সেবক, অনুশীলনের



## প্রাচীন চিত্র

ইনি জীবন্ত বিগ্রহ; নিত্য অমুঠানের কার্য্য করিয়াও স্নেহবশে ইনি কয়েকদিন উৎসবে আসিয়া সম্প্রতি বাধা হইয়া রাজ্যে মিথিলার ফিরিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্ত সীতাদেবী বড়ই স্ত্রিয়মানা; তাহার কোমল চিত্ত বড়ই কাতর। পত্নীবৎসল রামচন্দ্র তাঁহাকে সাহসনা দিবার জন্ত অস্তঃপুরে সমাসীন। এদিকে দশরথের ঔরসজাতা, লোমপাদের পালিতা কন্তার স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞে ব্যাপ্ত আছেন। বশিষ্ঠদেব, অরুন্ধতী ও কৌশলাদি রাজ্ঞীরা সে যজ্ঞের নিমন্ত্রণে তথায় গিয়াছেন। প্রকারান্তরে কবি সীতা-বিসর্জনকালে গুরু, গুরুপত্নী ও রাজ্ঞীদের অযোধ্যা হইতে সরাইয়া রাখিয়াছেন। ভবভূতির রামচন্দ্র যেরূপ কোমলপ্রকৃতি— তাহাতে তাঁহার পক্ষে গুরু, গুরুপত্নী ও জননীদেব উপস্থিতিতে সীতানির্কাসন করা সম্ভবপর ছিল না। বাস্তবিক দৃঢ়-প্রকৃতি কঠোর কর্তব্যপরায়ণ রামচন্দ্রে বাহ্য মানাইয়াছিল, ভবভূতির কোমলস্বভাব স্নেহার্জ-কর্তব্যভাসেবী রামচন্দ্রে তাহা মানাইত না। বশিষ্ঠদেবের উপদেশ, অরুন্ধতীর ভৎসনা, রাজ্ঞীগণের সাক্ষনয়নের নিষেধ অতিক্রম করা রামচন্দ্রের পক্ষে হুঃসাধ্য ছিল।

এইগুলি উপেক্ষা করিয়া সীতানির্কাসন করা বা নির্কাসন ব্যাপারে এইগুলি উপেক্ষা করা ভবভূতির রামচন্দ্রের পক্ষে প্রকৃতই সম্ভব হইত না। এই অভিনব রামচরিত-সৃষ্টির মধ্যস্থলে এ প্রকার বাধা আনিয়া উপস্থিত করা প্রতিভাবান্ কবি ভাল মনে করেন নাই। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইলেও ইহাতে কখনই রামচরিত্রের মাধুর্য্যটুকু কিছু রক্ষা পাইত না। রামায়ণের রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণকে ডাকিয়া বিতারকের মত বিচার করিলেন, লক্ষণকে স্থির ও ধীরভাবে সীতার বনবাস আজ্ঞা দিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের উপদেশ ও নিষেধ, অরুন্ধতীর ভৎসনা ও অনুরোধ, রাজ্ঞীদের অশ্রুজল ও হাহাকার রামায়ণের রামচন্দ্রকে

টলাইতে পারিত না। ভবভূতির ও রামায়ণের রামচরিত এক নহে, কাজেই অযোধ্যা হইতে অপসারণ-রূপ এই সাবধানতা এক সামগ্রী নহে।

ভবভূতির সৃষ্ট সীতাও তাঁহার রামচন্দ্রের অনুরূপ। তাঁহার রাম চরিত্র যেমন প্রেমে কোমল, বিপ্রলম্ব-করণে দুর্বল, সীতাও তজ্জণ প্রেমে বিহ্বলা, বিবাদে মুহমানা ও ভয়ে একেবারে আত্মহারা। সেই রামায়ণের তেজস্বী মহিমময়ী রাজ্ঞী এখানে “ত্রৈলোক্য-হারণ-কুরঙ্গ বিলোলদৃষ্টি।” সীতা মুগ্ধা নারিকাকা, করুণরসের জীবন্ত মূর্তি, মাধুর্যের স্বপ্নময়ী পুষ্পরানী।

রামায়ণের সীতা লঙ্কেশ্বর রাবণকে সম্মুখে দেখিয়াও ভয়ে আত্মহারা হয় নাই বরং সিংহীর মত গর্জিয়া তীব্র ভৎসনা করিতে থাকে ; কুত্বুরের এ হবিতকন লালসা—বলিয়া নানারূপ অপমান করিতেও কুণ্ঠিতা হয় নাই—পতিগর্বে গরবিনী, সতীত্বের তেজে তেজস্বিনী সীতার সে এক মূর্তি ! যারীচ রাক্ষসের কাতর ক্রন্দনে রামচন্দ্রের মৃত্যু-আর্তনাদ স্থির করিয়া লঙ্কণকে অকথা ভাষা রামায়ণের সীতাই বলিতে পারে এবং বলিয়াও ছিল। আর ভবভূতির সীতা রাবণকে সম্মুখে দেখিবামাত্র কুরঙ্গীর মত আর্তনাদ করিয়া উঠিল, একেবারেই মুচ্ছার কোলে চলিয়া পড়িল ; সতীত্বের গর্ব করিল না, পশুর অধম বলিয়া গালিও দিল না। ভবভূতির সীতার মানাইত না বলিয়াই লঙ্কণেব প্রতি রামায়ণের সীতানুরূপ কটুক্তি শোনা যায় নাই। বাঙ্গলার সমালোচক, ভবভূতিরই প্রাণ্য এই লঙ্কান বাঙ্গলার কবিকে দিয়া গিয়াছেন।

নির্কাসনকালে রামায়ণের সীতার পাঁচমাস গর্ভাবস্থা। নির্কাসন-দণ্ডে শুনিয়া সীতা—গর্ভস্থ শিশুর জন্ত হউক বা না হউক, আত্মহত্যা করিবার মন করে নাই। ভবভূতির সীতা নির্কাসন-সময়ে পূর্ণ-গর্ভা—লঙ্কণের চলিয়া যাইবামাত্র সজ্ঞানিই “পরিশ্ফুরিত-গর্ভভরাঙ্গনা”

## প্রাচীন চিত্র

বালা গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দিল। গর্ভস্থ শিশুর কথা ভাবিল না—আত্ম-  
হত্যার জন্ত কোন বিধা সন্ধান করিল না—একেবারে গঙ্গা-জলে  
ঝাঁপিয়াই পড়িল—তৎক্ষণেই বমজপুত্রের প্রসব। রঘুকুল-দেবতা  
ভাগীরথী আসিয়া শিশুদ্বয়কে বক্ষে ধরিলেন। মেহময়ী জননী ধরিণী  
আসিয়া কন্তাকে কোড়ে তুলিলেন। স্তম্ভ-ত্যাগের পর শিশুদ্বয়কে  
গঙ্গাদেবী উপনয়ন, বেদবিদ্যা ও শাস্ত্র শিক্ষার-জন্ত বান্দীকির করে  
অর্পণ করিয়া আসিলেন। সীতা পতিবিরহিনী আর পুত্রদ্বয়ও তাহার  
নিকটে নাই—এমনই সে অভাগী—পতি বিরহের উপর এই পুত্র বিরহ।  
তবে কন্তার পাতালে মাতার কাছে অবস্থিতি—ইহাই তাহার সুখ ও  
সাম্বন। বলা বাহুল্য, রামায়ণের সীতা বান্দীকির আশ্রমে আর পুত্রদ্বয়  
তাহার নিকটে। ভবভূতির সীতা প্রকৃতিতে কোমলা ছিলই, তত্ক্ষ-  
ণেই কঠোর পূর্ণগর্ভ-ভারে সম্পূর্ণ হুর্কলা হইয়া পড়িয়াছিল। এমনত  
কোমলা ও হুর্কলা—তাই এতবড় নিম্নিত নির্দাসনদণ্ডের আঘাত  
সহ করিতে পারে নাই। ভবভূতি সে অধিকতর কারুণ্যভাব ফুটাইবেন  
বলিয়াই যে সীতাকে “প্রাপ্ত-প্রসব-বেদনা” অবস্থার আনিয়াছেন, তীব্র  
দুঃখ-শোকের সংবেগে একেবারে গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দেওয়াইছেন—তাহা  
ভাবিলে কবি-প্রতিভার অসম্মান করা হয়। কবি রামচন্দ্রকে দেশাত্মরূপ,  
কালাত্মরূপ ও মানুষাত্মরূপ করিয়াই দাঁড় করাইয়াছেন; সীতাকে সেই  
রামচন্দ্রের যোগ্য অর্দ্ধাঙ্গিনী না করিলে মানাইবে কেন? তাই তিনি  
পর্যন্তের উচ্চস্থান হইতে রামচন্দ্রকে নামাইয়াছেন, আবার সীতাকেও  
নামাইয়া তাঁহারই পাশে বসিবার মত করিয়া দিয়াছেন।

আদর্শ নরপতিকে সীতাপতি করিয়া, তেজস্বিনীকে মাধুর্যময়ী করিয়া  
কবি নিজের কোমল মনোরক্তির পরিচয় দিয়াছেন। স্বপ্নময়ী মোহন-  
তুলিকা স্পর্শ করাইয়া নূতন সৃষ্টিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন।

রামচন্দ্র নূতন রাজা। রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বিনয় পূর্বক  
আছে, গর্ব অহমিকা লেশমাত্র জন্মে নাই। কথুকি “রামভদ্র” বলিতে  
দিয়া অর্কপথে ধামিয়া যেমন মহারাজ বলিল—অমনই রামচন্দ্র বলিয়া  
উঠিলেন,—“আর্ঘ্য, নহু রামভদ্র ইতোব মাং প্রীতি উপচারঃ শোভতে তাত  
পরজনন্ত” একটি কথাতেই রামচন্দ্রের বিনয়-নম্র স্তম্ভর চিত্রটি  
স্তম্ভর ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঋষিদিগের দ্বার সর্বত্রই অব্যাহত। বশিষ্ঠ-  
ঋষ্যশৃঙ্গের সংবাদ আনিয়াছেন—তাই এই রাজাস্তঃপুরে আহত।  
বশিষ্ঠদেব এবং ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহাদের কি বলিয়া দিয়াছেন, ইহা জানিতেই  
রামের আগ্রহ অধিক। ননদী শাস্তা কি মন্তব্য পাঠাইয়াছে, তাহা  
জানিতে সীতার বড় কোতূহল। সীতার আর দ্বারা সহে না, রমণী-  
প্রকৃতি সর্বত্রই একরূপ। সীতা প্রশ্ন করিল, “তাঁহারা কি আমাকে  
স্মরণ করেন? আমি যাই নাই, সেজন্য তাঁহারা কি কিছু অভাব  
অভূতব করিয়াছেন?” পূর্ণগর্ভা বলিয়া সীতার নিমন্ত্রণে যাওয়া হয়  
নাই, সেজন্য তাঁহারা কি কোন অভাব অভূতব করিয়াছেন, সে কথা  
কি কিছু জানাইয়াছেন?—সীতার ইহা জানিবার বড় আগ্রহ। ননদী  
শাস্তার সহিত সীতার বড় মনের মিল ছিল; শাস্তার স্বামী মহর্ষি  
ঋষ্যশৃঙ্গ আজন্মসিদ্ধ ঋষি ছিলেন; কাজেই তাঁহার উপর সীতার  
ভক্তি থাকিবারই কথা, ছিলও তাই। অষ্টাবক্র ঋষি সীতার  
কোতূহল চরিতার্থ করিয়া অগ্রেই জানাইলেন, “বৎসে, তুমি পূর্ণগর্ভা,  
এই কারণে তোমাকে আনিতে পারিলাম না; বৎস রামের ক তোমারই  
বিনোদনের জন্য তোমার নিকটে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া, একেবারে  
পুত্রকোলেই তোমাকে দেখিব”। লজ্জাশীলা সীতা সহসা এ কথা  
উত্তর দিতে পারে না। ঋষিবর সম্মুখে, পতিদেবতা নিকটে, এ ব্যবহার  
পুত্রের কথা উঠায় সীতার লজ্জাবশতঃ যৌনশ শোভমানই হইয়াছে।

## প্রাচীন চিত্র

রামচন্দ্র, ভয়ীপতি ঋষিপ্রের্ত তাপস ঋষাশ্রমের এই সম্মেলনট আশীর্বাদ বলিয়া বুঝিলেন, ইষ্টদেবতার নির্মালোর মত নতমস্তকে গ্রহণ করিলেন। তৃপ্তির হাসিতে রামের মুখখানি ভরিয়া উঠিল, লজ্জার নতনরনা সীতার চক্ষুতে লজ্জাক্ত একটা অন্নান সৌন্দর্য দেখা দিল। রামচন্দ্র জানিলেন—

“ঋষীগাং পুনরাভ্যানাং বাচমর্থোহনু-ধাবতি।”

গর্ভাবস্থায় যে অভিলাষ জন্মে, তৎকণাং তাহার পূরণ আবশ্যক। অষ্টাবক্র বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞা জানাইলেন—“গর্ভদোহদোহচিরাং সম্পা-দয়িতব্যঃ।” প্রজারঞ্জনই রাজার শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহাই রঘুকুলের চিরন্তন রীতি—গুরু এই উপদেশটিও অষ্টাবক্র রামচন্দ্রকে দিয়া গেলেন। গর্ভদোহন-রূপেই সীতার বনগমন ইচ্ছা উদিত হইল। প্রজারঞ্জনই রাজার ধর্ম—ইহা রামের চিত্তে কর্তব্যের প্রতি দৃঢ়তা আনিয়া দিল। সীতাবিসর্জন আকস্মিক উত্তেজনার পরিণাম নহে বা প্রবল মনোবেগনার ফল নহে—তাহা রামের কথাটিতেই প্রকাশ পাইতেছে—

স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।

আরাধনার লোকস্ত মুক্ততো নাস্তি মে ব্যথা।

স্নেহ, দয়া, সৌখ্য, এমন কি জানকীকে পর্য্যাপ্ত ত্যাগ করিতে আমার কোনই ব্যথা নাই—ইহা হৃদয়ের বাণী; অনুভূতজিত শাস্ত অবস্থায় এই হৃদয়ের বাণীতেই রামের চরিত্র মনোমোহন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামের এই প্রজারঞ্জনই লোকারাধনা, ব্রত, তপস্তা ও পরমধর্মপালন। ইহাকে কেবলমাত্র প্রজারঞ্জনী বৃত্তি বলিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিতে পারি না। সীতার সম্মুখে হাসিতে হাসিতে বিনি মনের এই কথা স্পষ্টভাবে বলিতে পারেন—তিনিই আদর্শ রাজা, তিনিই শ্রেষ্ঠ মানব, তিনিই নররূপী দেবতা।

## চিত্রদর্শন।

দূর্মনায়মানা সীতার চিত্রবিনোদনের জন্মই লক্ষণের চিত্র-দর্শনের অবতারণা। সীতার চিত্রপ্রিয় সেই বনভূমি, সেই বনবাস-সজিনী প্রাণসখী অননুয়া, জীবনের সুখ ও দুঃখের সঙ্গে ওতঃপ্রোত আত্মজসম সেই তরলতা, সেই পুত্র-নির্বিশেষ করিণোত, মৃগশিঙ, মধুর-শাবক। এ পুরাণচিত্র সীতার প্রিয় না হইয়া যায় না। রামের কথ্যা, রামের অলবীসা, অত্যাগী সীতার জন্ত রামের সেই দুঃখ ও সীতার তৃপ্তিপ্রদ না হইয়া পারে না। রামের সহিত শয়নে স্বপনে সেট স্বচ্ছন্দ-বিহারস্থলী দেখিবার ইচ্ছা হওয়া সীতার স্বাভাবিক।

বিরহের পর রামের সেই পাষাণবিদ্রাবী ক্রন্দন, ইহা সীতারই জন্ত সীতার ভাল লাগাই স্বাভাবিক ; কাজেই চিত্রদর্শন সীতার বড় তৃপ্তিকর।

প্রথম উদ্দেশ্য—

এই চিত্রদর্শনে রাম-সীতার বিরহের দৃশ্য সমাক্রমে ফুটান হইয়াছে। এ বিরহ প্রকৃত উপলব্ধি করিতে না পারিলে সীতা বিসর্জনটির প্রকৃত স্বরূপই বোধগম্য হইবে না। আবার এই বিরহ সমাক্রমে বৃদ্ধিতে হইলে উভয়ের মিলনের দৃশ্য—পলকে আত্মহারা, সুখাবেশে বিহ্বলতা—এই ভাবটিও ফুটান আবশ্যক।

রামসীতার বিরহ উপলব্ধির জন্মই চিত্রদর্শনে মিলন-দৃশ্যের অব-  
তারণা—ইহা বক্ষিমচন্দ্র তাঁহার উত্তর-চরিত সমালোচনায় ভালরূপেই বুঝাইয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে চিত্রদর্শনে মিলন দৃশ্য যেমন দেখান আছে, বিরহ দৃশ্যও তদ্রূপ, বরং তদপেক্ষা উজ্জলভাবেই দেখান হইয়াছে।  
তাহা হইলে বক্ষিমচন্দ্রের মতটি আমরা পরিকৃত ও সংশোধিত আকারে দেখাইতে চাহি,—

## প্রাচীন চিত্র

সীতা-বিসর্জন বৃত্তিতে হইলে রামসীতার মিলন-দৃশ্যের যেমন অবতারণা আবশ্যক, পূর্বকার বিরহ-দৃশ্যেরও (সীতাহরণাশ্রয়) অবতারণা সেইরূপ, বরং তদপেক্ষা অধিকই আবশ্যক। পদ্বীমরণে বা চির-বিসর্জনে কি মর্মান্তিক শোক—তাহার সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে পদ্বীর প্রতি ভালবাসা এবং পদ্বী-অদর্শনে বিরহযাতনাটিরও মর্ম্ম বোঝা প্রয়োজন। বিরুদ্ধ ও স্বজাতীর দুইটি দিক্ দিয়াই বস্তুটি বোঝা চাই। অরর ও ব্যতিরেক মুখ, এই দুইটি দিকে দার্শনিকেরা বুঝাইয়া থাকেন।

রাম সীতার পূর্বকার সীতাহরণ-বিরহের নাম দেওয়া যাউক—ছোট বিরহ। বর্তমান সীতা নির্কাসাশ্রয় বিরহেরও নাম দেওয়া হইল—বড় বিরহ।

সীতাহরণ-জন্ত বিরহ সীমাবদ্ধ—রাবণবধেই সে বিরহের অবসান, আর ইহা প্রতিকারাই বলিয়া সহের অতীত নহে। এই ছোট বিরহে আশা আছে—সীতার সহিত একদিন মিলন হইবেই। আশা থাকিলেই সকলই থাকে, আশা ফুরাইলেই সকলই ফুরায়।

“আশাবন্ধো জীবয়তি।”

সীমাবদ্ধ ও প্রতিকারাই সীতাহরণ-জন্ত বিরহ এমন মর্ম্মভেদী—বাহাতে পাবাণ দ্রবীভূত হয়, বনের পশুপক্ষী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকে—তাহা হইলে নিরবধি ও অপ্রতিকার্য্য সীতানির্কাসন-জন্ত বিরহ কত মর্ম্মভেদী ও বজ্রাকর—তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে?

তবেই রামসীতার প্রণয়, সীমাবদ্ধ হরণ-জন্ত বিরহ, আর নিরবধি-নির্কাসন-বিরহ—তিনটিই চিত্র দর্শনের বিবরণ হওয়া উচিত। রাম সীতাকে কিরূপ ভাল বাসিতেন এবং তাহাকে হারাইয়াই কিরূপ উদ্ভ্রান্তের মত আত্মহারা হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেন—

তাহার সমুজ্জল ছবিটি চিত্রদর্শনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সীমাবদ্ধ, আশাবিহীন বিরহের পার্শ্বে অসীম, আশাশূন্য বিরহ অধিকতর সমুজ্জল দেখাইয়া থাকে।

সীতাহরণ-বিরহ দৈবকৃত আকস্মিক ঘটনা। সীতানির্কাসন-বিরহ বহুস্ত-সম্পাদিত, কাজেই আত্মহত্যাভূল্য—এ নির্কাসন-বিরহে আবার মর্মান্তিক লজ্জা সংমিশ্রিত। হরণ-বিরহে কাদিবার উপায় ছিল—সেই কারণে দুঃখের কথঞ্চিৎ উপশম হইত। নির্কাসন-বিরহে কাদিবারও উপায় নাই বলিয়া তাহা মর্মান্তিকভাবে কেবল অশ্রুভূতিরই গম্য। প্রথমটিতে, রাবণবধাদি বহুকার্য্য ছিল, তজ্জন্ত দুঃখশোকের তাদৃশ অবসর ছিল না। আর দ্বিতীয়টিতে, সীতার জন্ত করিবার কিছুই নাই, তাহার উপর আবার গুরুভার রাজকার্য্য। বহি ও গজেন্দ্রকবচ পবিত্র জ্ঞানিয়াও সীতাকে লোকচক্ষুতে কলঙ্কিনীর মত পূর্ণগর্ভাবস্থায় নিম্নিত নির্কাসন-দণ্ড দেওয়ার যে বাতনা—তাহার শতাংশের একাংশ হরণ-বিরহে ছিল না।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—

ভবভূতি প্রথমে রামের বাল্যচরিত, ‘মহাবীরচরিত’ নাটকে বর্ণিত করিয়া অবশেষে অবশিষ্ট চরিত—বর্ণনার জন্ত উত্তররামচরিত নাটক প্রণয়ন করেন। রামচরিতে পূর্ব্বার্দ্ধ সংক্ষেপে বর্ণনা না করিলে উত্তর-রামচরিতের শেষার্দ্ধটির শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য থাকে না। বিশেষতঃ উত্তরচরিত নাটকটি স্বতন্ত্র নাটকরূপেও পরিগণিত হয় না। চিত্রদর্শনচ্ছলে বাল্য-চরিতটি প্রকারান্তরে বর্ণনা করাও হইল।

ভবভূতি প্রথম মহাবীর চরিতে বাল্মীকি-প্রদর্শিত পথ ভ্রাগ, ক্লরভ, সম্পূর্ণ পৃথক পথ অবলম্বন করেন—ফলে, নাটকখানির সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, রসসমুদ্রটি লবণাক্ত জলে পূর্ণ হইয়া যায়; শেষে উত্তরচরিত



## প্রাচীন চিত্র

প্রথমবারের কালে মহাবীরচরিতের অনন্ত পথ ছাড়িয়া দিয়া রামায়ণের চিরন্তন পথই গ্রহণ করিলেন।

মহাবীরচরিতে কৃত দোষগুলির পুনরুদ্ধার কি ভাবে করা হইয়াছে— তাহারই দুই চারিটি স্থল দেখাইতেছি মাত্র। মহাবীরচরিতে জনকভ্রাতা “কুশধ্বজ” বিশ্বামিত্র-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া সীতা ও উষ্মিলা সহ যজ্ঞস্থলে উপনীত। হরধনু যজ্ঞস্থলেই সুরক্ষিত—বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় সেই স্থানেই রামকর্তৃক হরধনু-ভঙ্গ। তৎপরে মিথিলাতেই বিবাহ-উৎসব আর বিবাহোৎসব সভাতেই বর্শিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ ও জনকের সম্মুখেই ভার্গবের আগমন—সেইস্থানেই তাঁহার পরাজয়।

উত্তর চরিতে চিত্রদর্শন প্রস্তাবে যেভাবে বালাচরিত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা রামায়ণেরই অনুরূপ। “এষ মিথিলা-বৃত্তান্তঃ” এইবার মিথিলা বৃত্তান্ত আরম্ভ। তার পরই সীতার উক্তি—“অনাদরখণ্ডিত-শঙ্করশরাসন আরাপুত্র আলিখিত ইতি”—হরধনু মিথিলাতেই ভঙ্গ হইল। “অয়ঞ্চ ভগবান্ ভার্গব” এই ভগবান্ ভার্গব। তারপরই আবার “এতে বয়মযোধ্যাং প্রাপ্তাঃ” এই আমরা অযোধ্যায় আসিলাম—পথিমধ্যেই ভার্গবের আগমন দেখা গেল।

মহাবীরচরিতে রাবণের মাতামহ মাল্যবান্ নামধের একজন রাজনীতিজ্ঞের অবতারণা আছে; রাবণের কুটবুদ্ধিমত্তী, মাল্যবান্ সীতাকে রাবণের করে অর্পণ করিবে বলিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া একজন দূতকে মিথিলায় প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহাতে অবশ্য লোভ দেখাইয়া কাশী উদ্ধারের ইচ্ছিতও ছিল; তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল; সীমা, কান দণ্ড নীতির কোন ফলই ফলিল না। কুটমত্তী তখন ভেদনীতি চালাইয়া রামের সর্বনাশের আরোজন করিল। শূর্ণপথা জাল-মহারা সাজিয়া ধর্মরথ-নাশকিত এক জাল পত্র, বৌদ্ধরাজ্যান্তিকক্ষেত্রে রামের হস্তে

প্রদান করিল; তাহাতে কৈকেয়ীর দুইটা বর প্রার্থনা ছিল; একটা—  
ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি; দ্বিতীয়—সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্রের চতুর্দশ-বর্ষ  
বনবাস। মন্ত্রীরা ইহা একটা কুট চাল।

রামকুল-নাশ রামের ভ্রত। তজ্জন্ত রাম ও লক্ষ্মণকে নিরাশ্রয়  
অবস্থায় বনমধ্যে হত্যা করাই মাণ্যবানের এই ভেদনীতি-প্রয়োগের  
উদ্দেশ্য; সীতাকে হরণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের মেকদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া  
তাহাদের মৃতপ্রায় করাও অত্যন্ত প্রয়োজন।

তৃতীয় উদ্দেশ্য—

উত্তরচরিতে ভবভূতি কোন কোন স্থলে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন  
করিয়াছেন, অথবা তাহাতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া নবীন  
সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে নূতন পদ্ধতি  
তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, চিত্রদর্শনের মধ্যেই তাহার পূর্ব-স্থচনার বীজটি  
সযত্নে উল্লিখ করিয়া রাখিয়া দিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চমাকে লবের জন্মসিদ্ধ জন্তকান্ন-প্রাপ্তির কারণটি একস্থলে বরদান  
উপলক্ষে ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন—

“সর্বধেনানীং স্বং প্রযুক্তিধূপহাত্তি”

একণে সর্বপ্রকারে জন্তকান্নবিভা। তোমার সম্মুখে সংক্রমিত হউক।

রামায়ণে সীতা লবকুশ-সহিত বাম্বীকি-আশ্রমেই প্রতিপালিতা।  
উত্তরচরিতে কিন্তু সীতা জননী বম্বুকরার গৃহে পাতালে অধস্থিত।  
লবকুশ স্তম্ভভ্যাগের পর হইতে বাম্বীকি আশ্রমে বিভ্রাণিকার্য্য প্রেরিত।  
উত্তরচরিতে সীতার পতিবিরহ ও পুত্রবিরহ দুইই।

রামায়ণে পাঁচমাস গর্ভাবস্থার সীতার বিসর্জন। উত্তরচরিতে  
“আতকফুরিত-গর্ভগুৰ্ব্বী” পূর্ণগর্ভ। সীতার নির্ধাণন। ভবভূতির সীতা  
বেদ্রপ শিরীষকোমল উপাদানে গঠিতা, তাহাতে তাহার পক্ষে অল্প

## প্রাচীন চিত্র

নিশ্চিত নির্কাসন-দণ্ড সহ করিয়া বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। রামায়ণের সীতা কোমলা ও কঠোরা—মাধুর্য্যের ছবি, তেজস্বিতার সূচী। রামায়ণের সীতা রাবণকে লঙ্কের রাক্ষস জানিয়াও নির্ভীকচিত্তে তীব্র তৎপরতা করে, ভবভূতির সীতা কিন্তু সেই রাবণকে দেখিয়াই কুররীর মত কাঁদিয়া উঠে। লক্ষ্মণ কিরিয়া যাইলে পর রামায়ণের সীতা রামের গর্ভস্থ সন্তানটিকে রক্ষা করাই তাহার শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—এই বুঝিয়া আত্মহত্যার সংকল্প পর্য্যন্ত করে নাই; ভবভূতির সীতা লক্ষ্মণ প্রত্যাগত হইবামাত্র তীব্রশোক-ক্ষোভের সংবেগে একেবারে গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপ দেয়। রঘুবল্লভ-দেবতা গঙ্গাদেবী অমনই বক্ষের পর সীতাকে তুলিয়া লইল; সেই ব্রহ্মরী দেবীর কোলেই সীতার যমজপুত্র কুশলব জন্মগ্রহণ করিল। গঙ্গাদেবী মুচ্ছিতা সীতাকে মাতা বসুন্ধরার নিকট রাখিয়া আসিয়া রঘুবল্লভের আসি-জননীরাই কার্য্য করিয়াছিলেন।

### চতুর্থ উদ্দেশ্য—

প্রকারান্তরে “বধুসংবাস-বিশ্রান্ত সাক্ষী” পঞ্চবটীর, “গদগদ নদদেশাদাবরী” নদীর, “বহুনির্ব্বার-কন্দর” প্রশ্রবণ-গিরির ও স্নিগ্ধভ্রাম “ভীষণাভোগ-রক্ষ” দণ্ডকারণ্যেরও বর্ণনা করা হইল। সেই পুত্রনির্ব্বিণেবে লালিতপালিত সুগণিত, ময়ূরশাবক ও করিপোত প্রভৃতির চিত্রগুলিও দেখান হইল। কবির ইজ্জতাল-পিচ্ছিকাবৎ বিচিত্র তুলিকার স্পর্শে জড়ও চেতন হইয়া উঠিল; পশু পক্ষীগুলি পর্য্যন্ত মানবমানবী আকারে দেখা দিল। পঞ্চবটী, গোদাবরী, দণ্ডকারণ্য ও প্রশ্রবণগিরি যে না দেখিল—তার পক্ষে রামসীতার আত্মকৈক প্রণয় উপলব্ধি হইল না; করিপোত, ময়ূরশাবক, সুগণিত যে না দেখিল, সে সীতা-চরিত্র কিছুই বুঝিল না। সীতার কি দেহ ও মহাবল্লভ—পশুপক্ষী, গিরিনদী ও অরণ্যে ছড়াইয়া আছে—এ কে

না দেখিল—সে সীতাকে কি বুঝিবে? যে সীতাকে না বুঝিল—সে তাহার প্রেম-বিরহের, কি ইয়ত্তা করিবে? সীতা-বিসৰ্জন কি বস্ত, তাহাই বা সে, কি উপলব্ধি করিবে? সীতার প্রতি রামের ভালবাসা, সীতার বিরহে রামের কষ্ট কেমন—ইহা যে না বুঝিল—সে রামের সীতা-বিসৰ্জনের কি বুঝিবে? সীতাবিসৰ্জন যে না বুঝিল—তাহার উত্তরচরিত পাঠই বুঝা।

সৰ্ব্বম উদ্দেশ্য—

রামই সীতার সৰ্ব্বম—রাম কাছে থাকিলে সীতার কাছে শ্রমণও নন্দনবন, অরণ্যও রাজ্যান্তঃপুর, মৰ্ত্যও স্বৰ্গ। রামের ভালবাসা, রামের কথা, রামের স্মৃতি, রামের হৃৎ—পতিগতশ্রাণ সীতার বড় প্রিয়। সীতা কি চাহে, কি ভালবাসে, কি দেখিলে ও শুনিলে তৃপ্তি পায়—লক্ষণের এ সকল ভালরূপই জানা আছে। বনগমন-স্পৃহা সীতা বহুদিন হইতেই মনে মনে পোষণ করে, সেই স্পৃহা এক্ষণে চিত্তদর্শনের ফলে আকুলতার পরিণত হইয়াছে মাত্র। সীতার বড় সাধ—সেই ঋষিকত্তা-গণকে, সেই বাসন্তীকে, সেই পশুপক্ষী ও তরুলতাদের আবার দেখে।

সীতার মনে হইতেছিল—করিপোতটি যেন তাহার কর্ণপূর হইতে লবলীপন্নব আকর্ষণ করিয়া লইতেছে। নেত্রপথে ভাসিয়া উঠিতেছিল—যেন ময়ূর-শিঙাটি করতালির সঙ্গে সঙ্গে মণ্ডলাকারে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। সীতা তখন এক নূতন রাজ্যে—যেন সে আৰ্য্যপুত্রের হস্ত ধরিয়া দক্ষিণারণ্যপথে প্রবেশ করিতেছে, স্নেহময় পতি গুরুতার আতপত্র মাথার উপর ধরিয়া আছেন; সীতার চক্ষু আবেশে মুদিত শ্রাব—এমন সময়ে গোদাবরী তট হইতে সৈকতলীন হংসশ্রেণী ডাকিয়া উঠিল, সীতার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, তন্ময়তা কোথায় বিলীন হইল—এ কি, এ যে চিত্র?

## প্রাচীন চিত্র

সীতা কোমলপ্রকৃতি, ভীক-স্বভাবা এবং রামময়-জীবতা; চিত্রে শূর্ণধার ছবি দেখিয়া ভয়ে উদ্ভ্রান্তা—চীৎকার করিয়া রামের সঙ্গে চলিয়া পড়ে। রাম বুঝাইয়া দেন “অগ্নি বিরহভীতে, এ যে চিত্র”। চিত্র দেখিয়াই বার ও ভয়, নির্জন অরণ্যে একাকিনী সে নির্দাসিতা হইবে? বিরহভয়েই যে কাঁপিয়া উঠে, তাহাকে চিরবিরহ সছ করিতে হইবে? হৃদয়ক্ষেত্র ঠিক প্রস্তুত না হইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। চিত্রদর্শন দ্বারা মহাকবি, পাঠক ও শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইলেন; নতুবা সরসরসও যে শুকাইয়া উঠিবে, সমস্ত পরি-শ্রমই যে বার্থ হইয়া যাইবে।

রামচন্দ্রের চরিত্রই অদ্ভুত—একদিকে উন্নতশির স্তম্ভের, অন্যদিকে নতমুখ কেতকী-তরু। লক্ষণ “অয়ং ভার্গবঃ” এই ভার্গব বলিয়া যেমন নামোল্লেখ করিবে—অমনই বিনয়ভিরাম রাম আপনার বিজয়-গর্বে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; যেন ধূটতা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণ ঋষির নিকট ক্ষমা প্রার্থনাই করিলেন।

লক্ষণ সীতার বিস্ফারিত নয়নের প্রতি চাহিয়া যেমনই মুষ্টিটি বর্ণনা করিতে বাইবেন—রাম অমনই অসহিষ্ণু হইয়া “অনেক দেখাইবার আছে, তাহা দেখাও” বলিয়া লক্ষণকে নিষেধ করিলেন।

পরাক্রান্ত শত্রুর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ মহাবীর কার্য্য বলিয়া অনেকে করেন, কিন্তু প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রশংসা স্তম্ভিতে হইবে বলিয়া এমত কুণ্ঠা—আপনাকে এমত অপরাধী ভাবা, সে এক রামেরই সাজে। প্রচ্ছন্ন অহমিকা চিত্র হইতে দূর করিতে পারাই প্রকৃত মহাঘৃহ।

সম্মুখে আর একটা চিত্র সীতাকে আকর্ষণ করিল। ইক্কা কু রাজারা প্রাচীন বনসে যে আরণ্যকব্রত গ্রহণ করিতেন—রামচন্দ্র নবীন যৌবনে আজ সেই ব্রত গ্রহণ করিতেছেন। এ গৌরবে, এ গর্বে সীতার নাসীহৃদয়

ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল; চক্ষু ছুটি ভালবাসার আবেশে চল চল ছল ছল হইয়া কম্পিত নীলপদ্ম-মালার আকার ধারণ করিল। ইহা সত্যের জন্ত রাজ্যত্যাগ, সর্বভাগ ও আত্মত্যাগ—তাই রাম অত্মদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া প্রেমপূর্ণ্যাসলিলা যযুকুলদেবতা ভাগীরথীর কথা আনিয়া ফেলিলেন; “সীতারাম শিবাহুধ্যানপরা ভব” বলিয়া সীতার শুভাশুভের ভাব ভাগীরথী-দেবীর উপর অর্পণ করিলেন। এই উক্তির জন্তই ভাগীরথীদেবী সীতাকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে তাহার পুত্রস্বরূপে স্তম্ভত্যাগের পর বাঙ্গালীক আশ্রমে রাখিয়া আসেন।

লক্ষ্মণ দেখাইল—“এই আৰ্য্যা সীতা, এই আৰ্য্যা মাণ্ডবী, এই বধু ঋতকীৰ্ত্তি”; উর্শ্বিলার নাম করিল না দেখিয়া সীতা হাসিতে হাসিতে লক্ষ্মণকে কহিল—“বৎস এই অপরটি কে?” দেবর ভাজের এই সরস রসিকতাটি বড়ই মিষ্ট, বড়ই উপভোগ্য। দেখা গেল, সীতাই মধুর রসিকতা করিত, লক্ষ্মণ কিন্তু তাহার উত্তর দিত না; জ্যোষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী আৰ্য্যা, পূজ্যা ও মাতৃতুল্যা বলিয়া লক্ষ্মণ সীতার সহিত রসিকতা করিত না। যে কখন সীতার মুখের পানে চাহিয়া দেখে নাই, সে রসিকতা করিবে কি? লজ্জার হাসি হাসিয়া—“অয়ে উর্শ্বিলাং পৃচ্ছতি আৰ্য্যা” বলিয়া লজ্জার হাসি হাসিল মাত্র। ইহাতে কেহ বুঝিবেন না যে—লক্ষ্মণ নিরীহ ও গোবেচারী কিবা অরসিক বোদ্ধা-মাত্রই ছিল। এ বিষয়ে একটি পুরাণ গল্প আছে, তাহা রামায়ণের না হইলেও প্রাচীন বলিয়া লিখিত হইল—

জনকালরে সীতার সখীরা প্রথম রামকে প্রণাম করিল, “বল দেখি, তুমি কার কন্যা বিয়ে করছ?” “কেন, জনকের কন্যা”—সখীরা অঞ্চলে মুখ চাখিয়া উচ্চ হাসি হাসিল। কোন স্ত্রীসক সখী শুনাইয়া দিল—“অজ-বংশে গুরুকম হয়।” অঙ্গগর্বে উল্লসিত সখীরা লক্ষ্মণের নিকটেই মুখের

## প্রাচীন চিত্র

যত উত্তর পাইল “ফেন, ভোমাদের জনকের কথা”—কাহারও মুখ লজ্জার নত, অগমানে বলিল, ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। জনকের কথা সহোদরা—ভোমাদের জনকের কথা কে—রসজ বুঝিয়া লটিল। অবচ ভোমাদের জনক—জনক রাজ্যে উহাদেই; ইহাতে দোষের কথা কিছু নাই।

সংসারে নানা দুঃখ শোক, দৈন্ত অভাব, অবজ্ঞা ও প্রতারণার মধ্যে আশিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন—সেদিন চলিয়া গিয়াছে। অতীত চিরদিনই মধুর, বর্তমান চিরদিনই দীন। রামচন্দ্র কিছু অবোধ্যার সিংহাসনে বসিয়া সীতাকে লাভ করিয়া এমন সুখের মুহূর্তে বলিলেন—“তে হি নো দিবঙ্গা গতঃ”। তরুণ-বরসের সেই আধ অহরাগ, আধ লজ্জা, সেই ধরি ধরি ভালবাসার খেলা বস্ত্রতই উপভোগ্য বোধ হইবারই কথা। সুখের চেয়ে সুখের স্মৃতি মধুর। বৌবনের উন্মুক্ত মুখ-সৌন্দর্য্য অগণক। কৈশোরের অর্দ্ধবৃত্ত মুখচ্ছবি অধিকতর চিত্তাকর্ষক।

কালিন্দীতটে “প্রাচ” নামক বটবৃক্ষ—সেই বৃক্ষতলে রামের উৎসর্গ আশ্রয় করিয়া সীতার দেহলতিকা অবসরভাবে শায়িতা; নির্জনে আলিঙ্গনচ্ছলে ক্রান্তিনাশক সেই মৃদু মৃদু সংবাহন, সীতা সেই স্মৃতিসুখ অহুতব করিবার জন্ত চকু মুদিল। ঐ “মেঘমেহুরিতনীলিম” প্রজ্বলন গিরি—তথায় “অবিদিত-গত-বাণা”, কত রাজি পোহাইরাছে। পরম্পরের বাহু পরম্পরের অঙ্গ বেঁটন করিয়া আছে, ক্রমশঃ রসাগাগের মুক্তবেগী-ধারা উচ্ছ্বাস-তরঙ্গিত জনদের মধ্যস্থল দিয়া বহিয়া বাইতেছে। বে তদন্তরতায় রাজধানী ও ধনারণ্যের ব্যকান নাই, বৈজালিক-বাচ ও সিংহবাজাদি নরকনের প্রভেদ নাই,—সেই তদন্তরতাই প্রেমের সুখ ও সর্গমুখ। রাম সীতার মিলনে সেই তদন্তরতা ছিলক উৎকৃষ্ট অভিনয়ের গুণই এই, অভিনয়কে অভিনয় বলিয়া বোধ হয় না, যাক্তব বলিয়াই বোধ হয়।

## উদ্ভবচরিত

চিত্র সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সীতা শূর্ণনখার চিত্র দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল—“হা আর্ধ্য-পুত্র, তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ শেষ হইল।” এ যে চিত্র—সীতার মনে নাই। ভাবনা-প্রকর্ষে স্মৃতি অমৃত্বের আকার ধারণ করে—ইহা দর্শনের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত। রাম আশ্বস্ত করিলেন—“অগ্নি বিরহ-ভীতে, চিত্রমেতৎ”—এ যে চিত্র।”

মিলন-রাজ্য শেষ হইয়া এইবার বিরহরাজ্যের সীমানায় আসা গেল। সীতা-বিরহে বিকশোদ্ভিন্ন, রাম কি প্রকারে বনে বনে উন্মত্তের মত ভ্রমণ করিতেছেন, পাষণ্ডবিদ্রাবী ক্রন্দনে কি ভাবে তিনি বনের পশু পক্ষীগুলিকে পর্যাপ্ত কাঁদাইতেছেন, পদ্মপলাশনেত্র হইতে অশ্রুধারা মুক্তামালার মত কি ভাবে টপ্ টপ্ করিয়া ভূমিতে নুত্তিত হইতেছে—সীতা সাক্ষনরূপে আর্ধ্যপুত্রের পতি সপ্রেম দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এত প্রেম, অভাগীর বিরহে রঘুনাথের এত ব্যথা!

তখন রামের হৃদয়ে অতীত দুঃখের সংস্কারগুলি হুঃখরূপেই ফুটিয়া উঠিয়াছে; রামের স্বপ্নও বেদনার ভাবে মুহূর্ত্তান হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ সুখের সময়ে অতীতদুঃখের স্মৃতি বেদনা দেয়, ইহাই কবির মত। রাম বলিলেন—“বিরহাগ্নি জীত হইলেও প্রতীকার আশায় সহ করা গিয়াছে; এখন চিত্র দর্শনে উহা বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া মর্দুহ ব্রণের মত আমাদের ব্যথা দিতেছে।”

কালিদাস রঘুবংশে চিত্র-দর্শন বিষয়টা অবতারণা করিয়াই বলিয়াছেন—সুখের সময় দুঃখের স্মৃতি সুখকরই হইয়া থাকে। “প্রাপ্তানি দুঃখাভ্যপি দণ্ডকেন্ সন্ধিস্থ্যমানানি সুখাত্তুবন্”। “কিং-নামধের” পর্ব্বতের ঐ ভূকুল—ওইখানে রোক্তমান রামজ্ঞে লক্ষণের উপর দেহভার তুল্য করিয়া দণ্ডায়মান! সীতা বাপ্পাকুল নরনে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; আপনায় মন দিয়া স্বামীর মনটি বুঝিয়া লইল। ঐ দীলাবান্ পর্ব্বত! না—ঐ দৃষ্টি



আর দেখা যায় না—“বৎস বিরত হও, আর আমি এ দৃশ্য দেখিতে পারিতেছি না”; রাম চিত্র-দর্শন বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। এইবার বৃদ্ধ—রাক্ষসবানরের শ্রবণবিহারী কোলাহল। অস্ত্রের বজ্রনা, আর শত শত বীরের ভূমিতলে চিরশয়ন। এ দেখার সহিত মিলন ও বিরহের তত সঞ্চক নাই; সীতার বিশেষ তৃপ্তিও নাই। সীতা নিক্কাসনের অনভূতির সহিত ইহা বিজড়িতও নহে।

রামের এ কষ্ট দেখিয়া “সীতার প্রাণ যদিও কাতর, চক্ষু অশ্রুস্রব হইয়াছিল, তথাপি ইহাতে আদর্শ পতিরতার একটি সৌভাগ্যগুরু ও ভালবাসার আত্মপ্রসাদ ছিল। সমবেদনার বালুকাচরে আত্মতৃপ্তির কল্পশ্রোত নীরবে বহমান ছিল। করুণরসের নাটক দর্শনে দুঃখ হয় তথাপি সহৃদয় রসজ্ঞ জন তাহা দর্শন করিতে ইচ্ছুক। দুঃখের মধ্যেও আনন্দময় রসের অনুভূতি নিয়তই বিজ্ঞমান থাকে। সীতা আপনার দুঃখ সামান্য বলিয়া বুঝিল, রাবণগৃহে অশোক-বনে সেই বহুগাপ্রাপ্তি তুচ্ছ বলিয়া মনে করিল। তখন সীতার ইচ্ছা—চিরপরিচিত বনস্থলী আবার দেখে, ঋষিপত্নীদের সঙ্গে আবার মেলামেশা করে; শুই সঙ্গে, পূর্ব-স্মৃতি-চিহ্নগুলিও একবার দেখিয়া আইসে। রামচন্দ্র গর্ভাবস্থার উপযোগী অশ্বলিত রথ প্রস্তুতের আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণ সে আদেশ পালনের জন্ত চলিয়া গেল। দশ মাস গর্ভাবস্থায় রথারোহণ অল্পচিত্ত—তাই কবি রথের “অশ্বলিত” বিশেষণ দিয়া সেই অল্পচিত্তটি পরিহার করিয়াছেন। শ্রান্ত জানকী অলস দেহভার আর বহিতে পারে না; রামের বিদ্যুত বকে স্নেহসিক্ত শিথিল বাহু দুইটি নিক্ষেপ করিয়া ঘুরাইয়া পড়িল। রামের বাহু-উপাধানে এ জন্মের মত সীতার আজ শেষ নিদ্রা! রাম ঘুমন্ত বুথখানির পানে চাহিয়া চাহিয়া নিজের সৌভাগ্যের কথাই ভাবিতেছিলেন; এমন সময়ে মুর্ত্তিমান অভিশাপের

## উত্তরচরিত

মত হুশুখ আসিয়া উপস্থিত হইল। “সীতার বিরহ ব্যতীত সকলই সুন্দর”  
রাম এই কথা যেমন বলিলেন—অমনই বিরহই বেন লম্বুখে দাঁড়াইল।

ভীষ্ম-সংবেগ বাথজ্জ নিক্ষেপ করিয়া হুশুখ আপনার নামের সার্থকতা  
সম্পাদন করিয়া গেল। অমঙ্গল ছায়া পশ্চাতে রাখিয়া ধুমকেতুর মত  
সে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। রামের সুখ শান্তির আজ অবসান। নিফলকা  
সীতার চরিত্রে বাহারা এত বড় কুৎসিত নির্দা উদগার করিল, রাজার  
প্রেমরাজ্য-প্রতিষ্ঠা জন্মের মত নষ্ট করিয়া দিল—সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজারা  
সাধারণ রাজার বিচারে দণ্ডাইই বিবেচিত হইত; কিন্তু লোকরঞ্জনই  
বাহার ত্রত—সেই আদর্শ রাজা তৎক্ষণাৎ প্রজাদিগকে দোষী করিলেন না—  
বরং বলিলেন—

“যচ্চাত্তং কৰ্ম্ম বিগৃহীকালে

প্রত্যেতু কস্তদভূবি দূরবৃত্তং ॥”

লঙ্কার অগ্নিশুদ্ধি—অযোধ্যার প্রজাদের তাহা বিশ্বাস না করিবারই  
কথা। লঙ্কণের মুখে “বাবদাৰ্ঘ্যায় হতালনে বিগৃহীঃ”—তিনিরা  
যে রাম বড় গলায় বলিয়াছিলেন—“উৎপত্তি-পরিপূতা সীতার আবার  
শুদ্ধি কি ?”—আর আজ সেই রাম নিজেই “বিগৃহী কালে” কথাটি  
ব্যবহার করিলেন। লঙ্কণকে যাহা বলেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের বাণী,  
জন্মের বিশ্বাস। হুশুখকে যাহা বলিলেন, তাহা প্রজার প্রতিনিধি  
রাজার কথা। ইহা লোকমন্ডের প্রতিধ্বনি রাজ। যখন তিনি সীতার  
পতি, তখন তিনি “বিগৃহী” কথাটি শুনিতে চাহেন নাই; আর এখন  
তিনি নরপতি, নিজের ধারণা যাহাই হউক না—তাহা যখন লোকমন্ডের  
বিকৃদ্ধ, তখন প্রজার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া দুর্বলতা দেখাইবেন—  
কেন? রাজাই রাজ্যের শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি, নীতি, ধর্ম ও আচারের  
রক্ষক। তাঁহাকে প্রজাসাধারণের দৃষ্টি লইয়া সাক্ষাৎ বিচারকের মত

বিচার করিতে হইবে। রামচন্দ্র তখন আদর্শ রাজার মত সীতার বর্জনই উচিত বিবেচনা করিলেন।

গৃহের শোভা, বক্ষোপরি নিদ্রিতা, “আতঙ্ক-ক্ষুরিত-গর্ভভারা” সীতাকে আজ চিরদিনের মত ত্যাগ করিতে হইবে, জনকনন্দিনী প্রিয়তমাকে সিংহ ব্যাঘ্রাদির বলিরূপে গভীর ঘনারণো কেলিয়া দিতে হইবে—উঃ কি ভীষণ রাজকর্তব্য-পালন! রাম আজি যদি ইক্ষ্বাকুবংশধর না হইতেন, রাজার আসনে না বসিতেন, তাহা হইলে নিজ বিবেকের বিরুদ্ধে হস্ত এ কার্য্য তাঁহাকে করিতে হইত না। সীতাচরিত্রে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিলে এ কার্য্য হয়ত তত কষ্টকরও হইত না। রামায়ণে সীতা বিসর্জন ব্যাপারে রাম ভ্রাতাদের লইয়া একটি বিচার করেন। ভবভূতির রামচন্দ্র সে বিচার করা বোধ হয় ভাল বুঝিলেন না। ঐ সাংঘাতিক সময়ে বিচার করার মত চিত্তের অবস্থা তাঁহার ছিল না, থাকিলে মানাইতও না। রাম একেবারেই সীতা-বিসর্জনে আজ্ঞা দিলেন; এমন কন্ম ইক্ষ্বাকুবংশে কাহাকেও করিতে হয় নাই বলিয়া আপনাকে নূতন রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়া দিক্তও করিলেন। সীতা নিব্বাসন অপূর্ব্ব কন্মই বটে। এমন ভালবাসার পত্নীকে, এমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভ্রাতৃপুত্রকে পূর্ণ-গর্ভাবস্থায় বনবাস দেওয়ারে আমরা লোকারাধনারূপ ব্রতপালনই বলি। রাম ব্যতীত এ কার্য্য কেহ করেন নাই, করিতে পারিতেনও না।

রাজাদিগের চরই চক্কু। দুর্মুখ স্বকার্য্যই করিয়াছে—তজ্জন্ত সে আদর্শ রাজার নিকট অহুযোগাই হয় নাই, বরং অস্ত গুরুতর কন্মভার পাইয়া, উপযুক্ত চরের যোগ্য আদরই পাইয়াছে। দুর্মুখের এ কন্মব্যাপালন, রামের কর্ণে সীতার কলক উন্মোচনারূপ হর্ভাগ্য তাহার ছিল—তজ্জন্তই তাহার নাম দুর্মুখ।

## উত্তরচরিত

রাম তখন বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন, সুখী সীতার পদযুগল মাথায় লইয়া সীতার প্রতি গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন।

“অরং পশ্চিমন্তে রামন্ত শিরসি পাদ-পঙ্কজস্পর্শ” আমার মাথায় তোমার পাদপদ্ম অর্পণ আজ শেষ হইল।

রাম যে মধ্যে মধ্যে সীতার পদ মাথায় লইতেন, তাহা নহে। পবিত্রা সীতার পাদপদ্ম মাথায় লওয়ার যোগ্য, ইহাই তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যাহা। স্বতঃ-পুত্র সীতার নিকট তিনি কত ক্ষুদ্র—কত উচ্চাসনে তাহাকে বসাইয়া তিনি পরিতৃপ্ত—এই ভাবই তাঁহার বন্ধমূল। রাম যে এতদিন সীতাকে হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ভাবিয়া আসিয়াছেন—ইহা মিলনের শেষ বারাক্ষেপে না জানাইলে জানাইবার আর অবসর মিলিবে না। পত্নী ধর্ম্মতঃ দাসী, তিনি পাত, ধর্ম্মতঃ প্রভু; কেমন করিয়া লোক-সমক্ষে তাহার পদস্পর্শ করিবেন? আর সীতাই বা তাহা করিতে দিবে কেন? সীতা গভীর নিদ্রামগ্না, চিরদিনের মত নির্কাসিতা হইতে চলিয়াছে, আজ আর লজ্জা সন্দোহই বা কি? অন্তরের প্রতিচ্ছবিই বাহিরে প্রকাশ পাইল, জীবনের ধারণাই কার্য্যাকারে কুটিয়া উঠিল। সীতার প্রতি অপরাধেরই আজ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

এইরূপ মনের অবস্থা—এমন সময়ে লবণ দৈত্যের দ্বারা উৎপীড়িত “অবিগণ অরক্ষণ্য অরক্ষণ্য” বলিয়া সাহায্যার্থী হইয়া আসিলেন। প্রজার প্রতিনিধি, দেশের শান্তিরক্ষক নরপতি—অমনই নিজের দুঃখবেদনা ভুলিয়া গেলেন, কঠোর কর্তব্যে বুক বাধিয়া তাঁহার দমনার্থ শত্রুকে শ্রেয়ণ করিবার জন্ত যাত্রা করিলেন। তখনই একবারমাত্র ফিরিয়া আসিয়া সীতার ঘুমন্ত মুখখানির পানে চাহিয়া—“ভগবতি বহুকরে, তোমার স্নানার্থীরা ছহিতাকে দেখিও” বলিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

হঃস্বপ্ন-বিপ্রলক্সা সীতা আসিয়া উঠিয়া উলিল—বনবাজার জন্ত রথ

প্রস্তুত। সীতা জানিত, বনগমনে রাম সঙ্গী হইবেন—তাই সে মনের আনন্দে ছুটিয়া গেল—হরিণী বংশীধ্বনি শুনিয়া মরণের পথে যাত্রা করিল। জন্মের মত সীতা নির্বাসিতা হইতেছে, অযোধ্যায় ইহা জানান অবশ্য নিরাপদ নহে। এ বিষয়ে বায়ীকি ও ভবভূতি একই পন্থা অবলম্বন করিলেন। নমো তপোধনেভ্যঃ, নমো গুরুজনেভ্যঃ, নমো আৰ্য্যপুত্র-চরণ কমলেভ্যঃ\* বলিয়া সীতা বনিকা অন্তরালে প্রস্থান করিল।

## দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথমেই বিকল্পক \*। বনদেবী বাসন্তী ও অধ্বগবেশা আত্রেয়ীর কথোপকথন। বাসন্তী সীতার প্রাণপ্রিয়া সখী ও পঞ্চবটা-বাসের বিশ্রুত সাক্ষী। আত্রেয়ী পুরাণ-ব্রহ্মবাদী বায়ীকির শিষ্যা ও ব্রহ্মচারিণী নারী। বাসন্তী সত্ত্বগুণময়ী, রসময়ী প্রবৃত্তি। আত্রেয়ী সত্ত্বগুণময়ী, শান্তিময়ী নিবৃত্তি। বাসন্তী প্রকৃতিরানীর জীবন্ত প্রতিমা। আত্রেয়ী আশ্রমবিদ্যার সঞ্চারিণী আকৃতি। একটি—রূপে ও গুণে রাজ্ঞী। অস্ত্রটি—সাধনা তপস্যার সন্ন্যাসিনী।

আত্রেয়ী কেন নদী; বনদেবী বাসন্তীর রেহময় বক্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। এ মিলন বড়ই সুন্দর, বড়ই উপভোগ্য। আত্রেয়ী কুলুকুলু করে কহিয়া গেল—বায়ীকি আশ্রমের কথা, যমজ-শিশু কুলীলবের কাহিনী। শিশুদের জীবদারুণ কুকনয়ন, আরক্তিম গুষ্ঠাধর, মৃণালগুহ্র ললাট ও ত্রমরচিকণ

\* বুদ্ধবর্ত্তিহীনানাম্ কথাস্তানাম্ নির্দশকঃ। সন্ধিপার্শ্ব বিকল্পঃ ভাদ্রাবকত্ব  
নির্দিষ্টঃ।

## উত্তরচরিত

কাকশব্দ ধীরে ধীরে মানস চকুর উপর ছুটিয়া উঠিল ; তাহাদের আকর্ষণ-  
শক্তি জন্তকাত্তের চিত্রটি প্রত্যক্ষ হইয়া দেখা দিল । মহাবি রামারণ অপরনে  
এবং শিশুদের স্বর-শিক্ষা ও বিদ্যাদানে এমনতরই ব্যস্ত বে, তাহাতে আত্মীয়ের  
পাঠের সুবিধা হইতেছে না । বিশেষতঃ প্রদীপ্তপ্রজ্ঞ কুশলবের সহিত  
তাহার সহায়দায়ন-যোগ থাকিতেছে না, ফলে ইহাতে তাহার লজ্জা  
ও সঙ্কোচই জন্মিতেছে । তাই সে বান্দীকি-আশ্রম ত্যাগ করিয়া, কত  
মিরিনদী পার হইয়া, দাক্ষিণাত্যে—অগস্ত্যপ্রমের অভিমুখে যাইতেছে ;  
পথের মধ্যে বাসন্তীর সহিত সাক্ষাৎ ।

আত্মীয়কে পথশ্রমে ও রৌদ্রতাপে ক্লান্তা দেখিয়া বনদেবী ফলকুসুমার্ষ  
দ্বারা তাহার তৃপ্তি বিধান করিল । “এই বন, যথেষ্ট ভোগ করুন ;  
আজ আমার সুদিবস” বলিয়া সাদর সম্ভাষণ করিল । তরুচ্ছায়া—আসন,  
বৃক্ষ বারি—পান্ন, ফলমূল—ভোজ্য, মধুর বাগী—ভোজন-দাক্ষিণ্য হইল ।  
বনদেবীর আতিথেয়তা ও নম্র ব্যবহার পরিশ্রান্ত আত্মীয়ের নিকট ফলমূল  
অপেক্ষাও উপাদেয় প্রতীত হইল । বাসন্তী দাক্ষিণাত্যের মহিমময়ী রাজ্ঞী,  
বনদেবীকপেই আখ্যাতা ; বস্তুতই সে দেবী । স্নেহে গোমুখী, মাধুর্য্যে  
অপরাজিতা, সরমে বনস্পৃথকা ও আতিথেয়তার ফলভরাবনতা আশ্রয়শাখা ।

এই আলাপে জানা গেল—যমজ শিশু ছইটী সীতার তনয় ; তাহাদের  
নাম কুশলব । বান্দীকির নিকট তাহারা শিষ্য এবং ছাত্ররূপে বিভ্রা  
এবং অল্প শিক্ষা করিতেছে । আরও জানা গেল, সীতাপতি রামচন্দ্র  
সীতারই হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ করাইয়া অযমেষ যজ্ঞে সুহৃদ্বর্ন-  
চারিত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা করিয়াছেন । ধূমপায়ী পুত্র আজ কঠোর তপস্কারত,  
তাহারই কলে ব্রাহ্মণ-শিশুর অকাল মৃত্যু, আর এইকন্তাই শঙ্কপাণি  
রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে আদিত্যেছেন—এই সকল তথ্য জানাইয়া আত্মীয়  
স্বহানে চলিয়া গেল ।

শূদ্র শব্দক উপস্ফারিত। সম্মুখে শঙ্করাণি রামচন্দ্র। রামচন্দ্রের উদার প্রাণ এবং স্বপরিণত বিবেক বলিতেছে—এ দণ্ড নহে, ইত্যাদি। বধার্থ তরবারি উঠিতে চাহে না। রাম তখন বলিতেছেন—

“রে দক্ষিণ হস্ত, মৃত ব্রাহ্মণ-শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্ত তুমি শূদ্রক মূনির উপর অস্ত্র ফেপ কর! তুমি রামের অঙ্গ, হৃদয়গর্ভ-খিনী সীতার নির্বাসনে পটু তুমি—তোমার আবার করুণা কি”?

প্রাণ এবং বিবেক বাহাই বলুক; তিনি যে আজ দেশের প্রতিনিধি দেশের শাস্ত্র ও আচারের রক্ষক, আইন অনুযায়ী প্রজার দণ্ডবিধাতা। শাস্ত্র ও দেশাচার বাহা বলে, দৈববাণি বাহা আদেশ করে, তাহার বিরুদ্ধে চলিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। নিজের বিবেক, নিজের ধারণা বা নিজের হৃদয়লতার দিক্ দিয়া বিচার করিতে তিনি পারেন না। সীতা বৃষজ্ঞানের মত এ কার্যেও তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া বাইতেছে। রামচন্দ্র আজ দেশের রাজা না হইলে হয়ত তাঁহাকে এ কার্য করিতে হইত না। কি সীতা বর্জন, কি শব্দক বধ—একই বৃত্তির কার্য; দুইটাই প্রজাহরজ্ঞানের পরাকর্ষ।

খড়্গ প্রহারের পর গভীর মর্শ্ববেদনার রাম বলিয়া উঠিলেন—

“কৃতং রামসদৃশং কৰ্ম্ম;” অপি জীবৎ স ব্রাহ্মণ শিশু”! রামের সদৃশ কর্ম্ম করা হইল, এক্ষণে ব্রাহ্মণশিশু বাঁচিবে ত?

এ অজ্ঞাধাত কেবল শব্দকের উপরই পড়িল, তাহা নহে, রাম নিজ দেহেও এ ব্যথা অনুভব করিলেন। দৈববাণি না হইলে রামচন্দ্র কখনই এ কার্য করিতেন না—এইটি বুঝিয়া বিচার করিলে রামচন্দ্রকে দোষী বলা চলে না; দৈববাণির উপর তাঁহার বিশ্বাসও অটুট। তথাপি এ বৃক্ষের কাঁড়ের কল যে শুভ—ইহা বিশ্বাস করিতে যেন তাঁহার উদার প্রাণ প্রস্তুত নহে।

## উত্তরচরিত

যাজ্ঞিকের পশুবলির মতই এই শব্দ-বলি। জন্মান্তরীণ ও ইহকৃত কৰ্মফল শেষ করিয়া শব্দ দিব্যদেহ লাভ করিল; তাহার পার্থিববাসনা তপনোদয়ে কুরাসার মত মিলাইয়া গেল। শূদ্রক জ্যোতির্ষয় মূর্তিতে রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া ব্রাহ্মণ-শিশুর জীবন-প্রাপ্তির সংবাদ দিল ও নিজের দিব্যদেহ এবং দিব্যধাম লাভের কথাও জানাইয়া গেল।

“সঞ্জীবিতঃ শিশুরয়ং মমচেয়মুচ্চিঃ”

শব্দকের এই আনন্দময় বৈরাজ-লোক-প্রাপ্তি না ঘটিলে হয়ত অনেকের মনে রামচন্দ্রের উপর একটি ক্ষোভ থাকিয়া যাইত। শূদ্রকের মূর্তির আকাজ্জক অতীব প্রবল, নচেৎ রাজদণ্ড উপেক্ষা করিয়াও সে কঠোর তপস্তা করিবে কেন? শাস্ত্র এবং আচার-বিরুদ্ধ হইলেও তাহার ধর্ম্মাহুতাঙ্গ অতুলনীয়। নতুবা রামচন্দ্রের আগমন এবং বৈরাজ প্রাপ্তিই বা তাহার ঘটিবে কেন?

উত্তররাম-চরিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভবভূতির অপূর্ণ রচনা। বীর, রোদ্র, বীভৎস, বিস্ময় ও ভয়ানক রূপে যে তাহার কি অসাধারণ শক্তি, তাহার পরিচয় ইহাতে পরিষ্কৃত। সমালোচক বলিয়াছেন “উৎকটে ভবভূতি”।

এই অঙ্কের প্রকৃতি-বর্ণনার সহিত রামচন্দ্রের মনোবৃত্তি যেন এক সুরে বাঁধা। বাহ্যপ্রকৃতি ও রামের অন্তঃপ্রকৃতি যেন দুইই বিষ ও প্রতিবিম্ব, যেন দুইটাই এক। রামচন্দ্রের মনোবৃত্তির বীণার যখন যে সুর বাজিয়াছে, বহিঃপ্রকৃতির যন্ত্রেও সেই সুরের প্রতিরঞ্জন শুনা গিয়াছে; রামের চিন্তে যখন যে রাগিনী বাজা আবশ্যক হইয়াছে, বাহ্য-প্রকৃতিতেও ঠিক সেই রাগিনীর তান কুটিয়াছে।

রামের মনোবৃত্তিই বাহ্যপ্রকৃতির আকারে প্রতিভাসিত, কিন্তু বাহ্য প্রকৃতিই রামের মনোবৃত্তির রাগে অল্পরঞ্জিত। রামের প্রকৃতিই বহিঃপ্রকৃতিরূপে, ইহা হৃদয়-চিন্তা। বহিঃপ্রকৃতি আর রামের মনোবৃত্তি



এক-ভাবাপন্ন বা পরস্পর বিষপ্রতিবিম্ব—ইহা সাধারণ চিত্র। রামের মনোহরিত্বের চিত্র আর গিরিনদী-বনময়ী প্রকৃতির চিত্র, সুন্দরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে—উভয়ের একই স্বর, একই স্বভাব, একই অর্থ ও একই উদ্দেশ্য।

শিখ-শ্রামাঃ কচিদপরতো ভীষণা ভোগরুদ্রাঃ

স্থানে স্থানে মুখরক্কুভো ব্যাক্তৈর্নির্ব্বাণাণাং ।

এতে তীর্থাশ্রম-গিরিসরিদগর্ভ-কান্তারমিশ্রাঃ

সন্মুখস্তে পরিচিতভূবো দণ্ডকারণ্য-ভাণাঃ ।

দণ্ডকারণ্যের একভাগ শিখশ্রাম, অপরভাগ ভীষণ-বিস্তার ও রুদ্র। স্থানে স্থানে, নির্ব্বারের স্বকৃত রবে দিব্ সকল মুখরিত। কোথাও তীর্থক্ষেত্র, আশ্রম, কোথাও গিরিনদী, কোথাও বা গর্ভ ও কান্তার অবস্থিত।

রামের হৃদয়ের পানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়—একভাগ কি শিখ, কি নগ্ননরঞ্জন! অপর ভাগ কি ভীষণ-বিস্তার, কি রুদ্র। কি নগ্ননরঞ্জন, কোমল অথচ কঠোর মনস্কন্দ দৃষ্ট! রামের হৃদয় স্বভাবতঃ শীতল ও রমণীয় ছিল, কিন্তু এখন বহুতরুত সীতা নির্ব্বাসন-জন্ত বেদনার সে হৃদয় মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে। চারিদিকে তপ্ত বালুকারাশি ছুটিতেছে; জল নাই, তৃণ নাই—উঃ সে কি ভীষণ, কি করুণ! মনস্কন্দ যাতনা সহিয়া সহিয়া তাঁহার কোমল বক্ষ ক্ষতবিক্ষত, প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়াছে। পুণ্যতীর্থের পবিত্রতা, আশ্রমের শান্তি, উত্তম শৈলশিখরের উচ্চতা বিরাজমান; স্বচ্ছ তোরা তটিনী কুলুকুলু নিনাদিতা। আবার গভীর ক্ষতের মত বিশালমুখ গর্ভগুলি—হাঁ করিয়াই আছে, কান্তারের মত দুঃখগুলি অসাড় ভাবে পড়িয়া আছে।

দণ্ডকারণ্য অভিশপ্ত ভূভাগ অথচ জনহীনও বটে। রামের হৃদয়ও

## উদ্ভবচরিত ।

নির্কাসনতাপে অভিশপ্তবৎ, সংযমে ও পবিত্রতার আশ্রমবৎ । দণ্ডকারণ্যের একদিকে সর্বভূতলোমহর্ষণ উন্মত্ত খাপদকুলের শ্রবণ-বিদারী গর্জনে গিরিগহ্বর কি ভীতিকর ! আবার এইরূপ গিরিগহ্বর সমেত দীর্ঘ অরণ্যানী যেন স্বতন্ত্র পৃথিবীর মতই দক্ষিণ দিক্ ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত । রামের হৃদয়েও উন্মত্ত শোকের কি প্রচণ্ড কোলাহল, কি ভয়ানক হাহাকার ধ্বনি ! ঐ কোলাহল ও হাহাকারে পূর্ণ অতলম্পর্শ হ্রঃখ-গহ্বরও রামের দেহ, ইন্দ্রিয় ও চিত্তের মধ্যেই নিম্নত বিরাজিত ।

নিকুঞ্জভূমিতাঃ কচিৎ কচিদপি প্রোচ্চওলম্বনানি

স্বচ্ছাস্তপ্ত-গভীরঘোষ-ভূজগন্ধাস-প্রদীপ্তাশ্রয়ঃ ।

সৌম্যানঃ প্রদরোদরেবু বিলসৎ স্বরাস্ত্রসৌ বা স্বয়ং

তৃষ্ণাভিঃ প্রতিস্ব্যাক্টৈরজগর-স্বৈদ্রজবঃ পীয়তে ॥

দণ্ডকারণ্যের একস্থান পক্ষিকুজনরহিত ও তিমিত ; অপরস্থান বন্তজন্তুর কোলাহলে মুখর ও ভীষণ । রামেরও বামপার্শ্ব নিঃশব্দ মৌন, দক্ষিণপার্শ্ব হাহাকারময় । স্বচ্ছন্দহস্ত, বিহ্বলকণা সর্পকুলের নিবাস বায়ুর ফুৎকারে দাবান্নি হু হু করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইতেছে । রামের অন্তরে মন্দোভূত বিরহাগ্নিও প্রিয়-স্মৃতিচিহ্ন-দর্শনে বিগুণভাবেই জলিয়া উঠিতেছে । আলবাগের একপ্রান্তে অন্নমাত্র বারি চিক্ চিক্ করিয়া শোভা পাইতেছে । সেইখানে তৃষ্ণাতুর কুকলাসগুলি স্বচ্ছন্দাবস্থিত অজগরের দেহ-স্থান্য স্বৈদ্রজল পান করিয়াই আকর্ষিত হুকা নিবারণ করিয়া লইতেছে । রামেরও মর্ম্মদেশে কর্তব্যপালন-বর্ম্ম ও ঐজারজম-ব্রতের স্বচ্ছ জলধারা মুহু মুহু বহিতেছে ; অন্তঃস্থ শোকতাগের কুকলাসগুলি বাহিরে আসিয়া দেহ নির্গত বৈদবারি মুহুর্ভেই ওবিলা লইতেছে ।

সেই জনস্থান, সেই চিরপরিচিত ভূতপূর্ব্ব ধরালয় জনস্থান ।

অশ্রুতনোদগমনের অন্তরালে রাম কোনরূপে তাহা দেখিতে লাগিলেন। পূর্বাভূত অতীত ব্যাপারগুলি প্রত্যক্ষের মত তখন তাঁহার চিত্তে ভাসিয়া উঠিল। স্মৃতি অল্পভবের আকারে দেখা দিল। বৈদেহীর বড় প্রিয়, সেই সেই বনস্থলী—রামের কাছে আজ হৃৎখময়ী বলিয়া বোধ হইল। মধুসূদনী উপবনের শ্রামল যৌবনত্ৰী আজ রাক্ষসীমূর্তি ধরিয়া সম্মুখে আসিল। স্মৃতির সময়ে বাহার শোভার প্রান্তদেহ স্নিগ্ধ, ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় তৃপ্ত, উভয় প্রাণ কষ্ট হইত, আজ হৃৎখের সময়ে সেই শোভাই দেহকে বিকল, ইন্দ্রিয়কে বিলাস প্রাণকে তিত্ত করিয়া তুলিল। সেই কুসুম-স্মরতি প্রমোদবন, সেই ঘনবিলুপ্ত তরুশ্রেণী, সেই হংসমালা-মুখর নদীতীর রামকে এক অজ্ঞের মোহে আচ্ছন্ন করিল। সেই বিশ্রুত-সাক্ষী শয়নীর শিলাভল, সেই সীতা-সংবর্ধিত ময়ূরশাবক, সেই সন্তানপ্রতিম করিপোত ও সেই মাতৃহারা মৃগশিশু রামের দেহেইন্দ্রিয়কে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। রামের তখন মনে পড়িতে লাগিল, সীতাসহ সেই সুখভ্রমণ, সীতাসহ সেই বিশ্রুত আলাপ, সীতাসহ সেই “অবিদিত গত্যামা” রাত্রি অতিবাহন।

সেই প্রিয়স্মৃতিচিহ্ন এখন এত হৃৎখপ্রদ—হার, তাহা দেখার আর আবশ্যক নাই। তাই শব্দুক “তদলমেভিহঁরাসদৈঃ” এ দুর্দর্শ স্থান দেখার প্রয়োজন নাই বলিয়া প্রশান্ত-গভীর মধ্যমারণের কথা পাড়িল। যার প্রান্তভাগ, মদমত্ত ময়ূরের কণ্ঠছবির মত চিকণ; যার স্তরুতল, নীলবহল নিবিড় ছায়ার স্নিগ্ধশীতল; যার ক্রোড়দেশ বিবিধ মৃগকুলের ইতস্ততঃ সঙ্কারণে প্রিয়দর্শন; সেই মধ্যমারণ্যকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই শব্দুক হৃৎখ-বিনোদনের উপায় বলিয়া বুঝিল। রামচন্দ্রের হৃদয় আজ জনহানের প্রিয়-স্মৃতি-চিহ্ন দেখিয়া দুর্বল, কাতর ও মোহাচ্ছন্ন; সে হৃদয়ে এখন প্রশান্ত-গভীরতাব আনয়ন করিতে পারিলেই বে স্মৃতি ও শান্তি লাভ হইবে—ইহা স্বাভাবিক।

## উত্তরচরিত

রামের চিত্ত যেমন একদিকে কুসুমবৎ কোমল, অপরদিকে তেমনই বজ্রবৎ কঠোর। ইহা মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের প্রকৃতি। একদিকে—নির্ঝরিনী কুলু কুলু শব্দে ও তর তর ভাবে বহিতেছে, অপরদিকে—দাবান্নি হু হু শব্দে খরবেগে জ্বলিতেছে। নরপতি রামচন্দ্রে দৃঢ়তা, চিত্তসংযম, সহিষ্ণুতা ও প্রজানুরঞ্জনরতপালন। সীতাপতি রামচন্দ্রে কোমলতা, দৌর্বল্য, অধৈর্য্য ও মৰ্ম্মস্বদ রোদন।

মধ্যাহ্নের নমনীয়া বেতসলতার মৃদুল দোলনে, স্বচ্ছসলিলা প্রবাহিনীর স্নীত তরঙ্গে, শিশির-কষায় শল্লকীর প্রসৃত গন্ধে রামচন্দ্রের মন প্রাণ তৃপ্তি ও শান্তিলাভ করিল। শব্দকণ্ড রামচন্দ্রকে স্থির ও শান্ত দেখিয়া অগন্ত্যদেবকে প্রণাম করিবার জন্ত অগন্ত্যশ্রম অভিমুখে প্রস্থান করিল।

রামচন্দ্র এখন একাকী। প্রবাহিনীর কুলুকুলুধ্বনি আর অধিকক্ষণ রহিল না, ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। শল্লকীর শিশির-কষায় গন্ধও আর ভাসিয়া আসিয়া দেহেন্দ্রিয় বিনষ্ট করিল না। রাম “শোকমাত্র দ্বিতীয়” হইয়া—সেই উৎপল-বিষম পৰ্কটপথে বেড়াইতে লাগিলেন।

সেই সীতা-পালিত ময়ূরের দল, আজিও সীতা-সংবদ্ধিত তরুণিরে বসিয়া কেকাধ্বনি করিতেছে। সেই সীতাকর-লিপ্ত চম্বর-ভূমিতে পুত্রনির্বিশেষ হরিণের ‘পাল’ আজিও পূর্বমত ছুটাছুটি করিতেছে। সেই “আমঞ্জু বজুললতা” সেই অবিরলনীল নিচুল তরুশ্রেণী, সেই কেতকী স্বরভি সরিৎ-তট; রাম সম্পূর্ণনেত্রে তাহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেই প্রস্রবণ গিরি—যাহা দূর হইতে মেঘমালায় মত; সেই গোদাবরী নদী—যাহা দক্ষিণ-দিগ্ধ্রুর হিরণ্যয়ী কাঞ্চীর মত; সেই গিরিশৃঙ্গ—যাহা পরার্থে ত্যক্তপ্রাণ মহাত্মা জটায়ুর আবাসস্থল; রাম সেই সেই স্থানগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া বাইতে লাগিলেন। সেই স্থখে দুঃখে ধেরা, সেই স্বতিরাগে রঞ্জিত করা, সেই শরনে স্বপনে ভ্রমনে উপবেশনের

নিরত সখী বনস্থলী,—রাম বর্তমান তুলিয়া অতীতের স্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিলেন। “বিরহে তনয়ঃ জগৎ।”

কি সুন্দর বনভাগ! আর কিবা গোদাবরী সলিলে শ্রামলতরু-শ্রেণীর রমণীয় প্রতিকলন! কে যেন গোদাবরীর স্বচ্ছ-সলিলে শ্রামল তরুর শ্রীগুলিকে সাজাইয়া দিয়া গিয়াছে। প্রতিকলিত ছায়াগুলি (প্রতিবিম্ব) ইন্দ্রজাল স্পর্শে যেন সত্যকারের তরুশ্রী হইয়া দেখা দিয়াছে। তরু-শাখার অন্তরালে পার্শ্বকূলের মধুর কুজন—সে কি স্রুতিসুভগ! কে বলে বনস্থলী মৌন, জড় ও প্রাণহীনা? যার কণ্ঠে অমন কলধ্বনি, সে কি মৌন? যার স্বরে অমন মাদকতা, সে কি জড়? যার বক্ষে অমন সর্বজনীন স্নেহ ও দয়া, সে কি প্রাণহীনা?

অদূরে, ওই সেই পঞ্চবটী—বহুদিনের বিবিধ বিশ্রান্তসাক্ষী! ওহ স্থানেই না—সীতার প্রিয়সখী বনদেবী বাসন্তীর বাসভবন?

এই অবস্থাবিপর্ধ্যাসের কালে কিরূপে রাম ওই পঞ্চবটীতে সীতার প্রিয়সখী বাসন্তীর সহিত সম্ভাষণ করিবেন? বাহার সহিত বসিয়া একদিন নন্দনের অপূর্ণ সঙ্গীত ধ্বনি গুনিয়াছিলেন, আজ সেই সখী বাসন্তীর সহিত কিরূপে একত্র বসিয়া শ্রুগানের করুণ হাহাকার তুলিবেন? এই ভাবিয়া তাঁহার মন হাহাকার করিয়া উঠিল।

তখন রামের মনস্থল কৃতকার্যের অনুশোচনার বিদীর্ণ হইতেছিল; উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে বেদনাঙ্কীর্ণ পঙ্কর সকল বন্ বন্ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল; ইতস্ততঃ প্রসৃত কেশভাবে পূর্ণচন্দ্রবৎ মুখখানি মেঘে-চাকা পড়িতেছিল, বোধ হইতেছিল—অন্তঃপ্রদেশ হইতে বহির্গত যন্ত্রণার কালিমরাশি যেন সর্বত্র ছাইয়া আছে।

রাম তখন চারিদিক্ অন্ধকারময় দেখিয়া নিজ হৃদয়ের পানে চাহিয়া দেখিলেন—সেখানেও চির অন্ধকার, আলোকের রেখা মাত্র নাই। যেন

## উত্তরচরিত

সুতীত বিধরস তাঁহার মর্শ্বস্থলতলে অকস্মাৎ সঞ্চারিত হইয়া পড়িল ;  
যেন তীক্ষ্ণ শল্যখণ্ড দেহমধ্যে সহসা প্রবিষ্ট হইল ; যেন দৃঢ়-বন্ধযুগ  
ত্রণ বন্ধোন্মোহে মুহূর্ত্তের ভিতরে কাটিয়া গেল। বনীভূত শোক  
আসিয়া আজ তাঁহাকে বিবশ ও মূৰ্ছিত করিয়া দিল।

পুরা যত্র শ্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং

বিপর্যাসং বাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিক্রহাং ।

বহোদৃষ্টং কালাদপরমিব মন্ত্রে বুনমিদং

নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং দ্রুতয়তি ॥

পূর্বে যেখানে শ্রোত বহিত, এখন সেখানে নদীর পুলিন দেখা  
যাইতেছে। বৃক্ষসকলের ঘনসন্নিবেশ কোথাও বিরল, বিরলভাগ  
কোথাও নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। বহুকাল পরে পরিদৃষ্ট এই বনটি  
অপর বন বলিয়া প্রতীত হইতেছে ; কেবল পর্বতের স্থির অপরিবর্তিত  
সন্নিবেশ বুঝাইয়া দিতেছে—এই সেই বন।

বস্তুতঃ রামের অন্তঃ-প্রকৃতি এস্থলে বাহ প্রকৃতির আকারে বিবর্তিত  
হইয়াছে, কিম্বা বহিঃপ্রকৃতি ( বনস্থলী ) এবং রামের অন্তঃপ্রকৃতি  
একইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। রামের অন্তরে, যেখানে প্রণয়ের শ্রোত  
বহিত, এখন সেখানে দুঃখের চড়া ধূ ধূ করিতেছে। বে ক্রমে মিলনের  
সুখরাগিণী বাজিত, তথায় এখন বিবাদের করুণস্বর রণিয়া রণিয়া উচ্ছ্বসিত  
হইতেছে। সুখ—শোকে, মিলন—বিয়হে পরিণত। রামের জীবলোক  
বিপর্যাস্ত। রামকে আর রাম বলিয়া চেনা যায় না ; কেবল তাঁহার  
সৌমা-গম্ভীর অহুভাব-সৌভাগ্য পর্বতের মত অবিচল—তাই সেই রাম  
বলিয়া কোনমতে বুঝা যাইতেছে। লাবণ্যময়ী মুকামল-তরলা হারা  
যেমন শকুন্তলার কীর্ণ পাণ্ডুদেহ ত্যাগ করে নাই, এই অহুভাব-সৌভাগ্যও  
তদ্রূপ রামের বিপর্যাস্ত দেহ ছাড়িয়া যায় নাই।

রাম আর পঞ্চবতী দর্শনে আপনাকে স্থির রাখিতে পারিতেছেন না ; পঞ্চবতীর চিরপরিচিত দৃশ্যগুলি দেখিয়া অশ্রুবেগে কোনমতে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছেন না । পঞ্চবতী ছাড়িয়া যাইতে পারিলেই যেন তিনি স্বস্তি পান, অথচ পঞ্চবতীর স্নেহ চুষকের মত লৌহখণ্ডবৎ তাঁহার হৃদয়টিকে আকৃষ্ট করিতেছে । যে পঞ্চবতী—সুখের সময়ে বিবাহের বাসন-গৃহের মত সুখ দিয়াছিল, স্বর্গের অমৃতের মত রসাস্বাদে তৃপ্ত করিয়াছিল ; দুঃখের সময়ে রাম আজ কেমন করিয়া তাহাকে অকৃতজ্ঞের মত ছাড়িয়া যাইবেন ?

আজ যে তিনি পতিপ্রাণা জানকীকে করিশুণ্ড-ছিন্ন লতিকার মত সবলে আশ্রয়চ্যুত করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন ; আজ যে তিনি অনন্তাশ্রয়া প্রিয়তমার মৃণালতরুল অঙ্গখানি হিংস্র ঋপদেব মূঢ়্যমুখে কেলিয়া দিয়াছেন ; আজ যে তিনি আদর-পালিতা বিশ্বস্তা গৃহ-শকুন্তিকাকে কসাইয়ের মত ছুরিকাঘাতে হত্যা করিয়া কেলিয়াছেন—কোন মুখে তিনি সেই নিজের কালা-মুখ পঞ্চবতীর কাছে দেখাইবেন ? ছায়ার মত সজিনী, হোমায়ি-শিখার মত পবিত্রা জানকীর উপর নির্দিত নির্দাসন-দণ্ড নিক্ষেপ করিয়া এখন তার কি উত্তর দিবেন ? পঞ্চবতীর প্রত্যেক তরুলতা, প্রত্যেক পশুপক্ষী এখনও সেইমত আছে, কিন্তু আজ সেই সীতা কৈ ?

এইবার রামের হৃদয়-সাগরে মহন আরম্ভ হইল,—অমৃত আর নাই ; এখন শুধু হলাহলই উঠিবে । উপায় কি ? সে হলাহল এখনই যে রামের জীবন শেষ করিবে ! যে সঞ্জীবন মন্ত্র এই বিষক্রিয়া নিবারণে সক্ষম, যে নীলকণ্ঠ এই বিষ জীর্ণ করিতে সমর্থ—তাহা আজ কোথায় ? মূর্তিমান্-আশ্বাসদায়ী শব্দ ও তৎক্ষণাৎ অগস্ত্যশ্রম হইতে ফিরিয়া অগস্ত্যদেবের শুভাদেশটি অক্ষয়কবচের মত বহিয়া আনিব । শব্দ জানাইল—

## উত্তরচরিত

স্নেহবৎসলা অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা বিমানাবতরণের মাল্য-সম্ভার হস্তে লইয়া আশ্রমবাসী ঋষিবৃন্দের সহিত অযোধ্যানাথের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

যাত্রার একটি গওঁবে সপ্তসমুদ্র নিম্নেবে শুকাইয়া গিয়াছিল, বাহার একটি আদেশে উন্নত-শৃঙ্গ বিক্রা চিরদিনের মত নতশির হইয়াছিল, বাহার একটি অভিসপ্তাতে ইন্দ্র-পদারূঢ় নহবরাজ সর্পরূপে ধরাতলে পড়িয়াছিল— সেই মহর্ষি অগস্ত্যদেবের আজ্ঞা। তৎপত্নী স্নেহবৎসলা লোপামুদ্রারও অহুরোধ! রামের মোহ, দুর্বলতা, অধৈর্য্য, হুঃখ ও শোক মুহূর্তের মধ্যে অপগত হইয়া গেল; ঐন্দ্রজালিকের করস্পর্শে ছায়াবাজীর মত বেন সে সকল অকস্মাৎ আত্মগোপন করিল। “ভগবতি পঞ্চবটি, গুরুজনের আদেশ ও অহুরোধে আমার এই অতিক্রম মার্জনা করুন” বলিয়া রামচন্দ্র অগস্ত্যপ্রমতিমুখে কিরিবার উপক্রম করিলেন।

এইবার আশ্রমের মধ্যে আশ্রমরক্ষক সত্ৰাটকে প্রবেশ করিতে হইবে, ঋষিভক্ত ধর্মপরায়ণ রঘুবংশতিলককে মহর্ষির আশীর্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, বোগ্য সন্তানকে মার্তার পবিত্র ক্রোড়ে বাইরা উপবেশন করিতে হইবে—কাজেই এ সময়ে আপনাকে স্থির, ধীর ও অবিচলিত রাখা আবশ্যক; হুঃখ শোক, দুর্বলতা, অধীরতা, ও মোহ লইয়া আশ্রমে যাওয়া চলিবে না। এখন ক্রৌঞ্চাং গিরির মত উন্নতশির, স্বমহিমোন্নত ও স্তদৃঢ় হইয়াই তথায় বাইতে হইবে।

“কুৎং-কুৎ-কুটীং-কোশিক-বটা \* \* ক্রৌঞ্চাবতোহং গিরিঃ”

তথার পেচককুলের কুৎকার-রবে ভীত বায়সের দল বংশভুক্ত-মধ্যে মুখ লুকাইয়া রহিয়াছে, ময়ূরের রবে কম্পিত সর্পকুল পুণ্য চকন তরুর কোটরে বাইরা আশ্রয় লইয়াছে। আর এদিকেও সম্ভ্রান্তের আগমনে রামচন্দ্রের রজস্তমোভাব বাহ্য কিছু ছিল, মিলাইয়া গিয়াছে; ভক্তির উদয়ে আর শাস্তির আবির্ভাবে মোহ এবং অশান্তি সম্পূর্ণ দূরীভূত



হইয়া পড়িয়াছে। অথৈয়া ও দৌর্য্য-প্রভৃতি কার্যগুলি স্ব স্ব কারণে অন্তর্লীন হইয়া রহিয়াছে।

তখন ইকাকুলপ্রদীপ অযোধ্যাধিপতির চিত্তকুহরে গোদাবরীর গগনদরবের মত আনন্দ-প্রবাহের কুসুম কুসুম ধ্বনি শোনা গেল। সংঘম ও মোহ, সঙ্কীর্ণতা ও হৃৎ, চিত্তবল ও চর্য্যনতার কিয়ৎকালব্যাপী সংঘর্ষের ফলে এক অপূর্ব তরঙ্গের উদ্ভব দেখা দিল। সেই শোক হৃৎখে মরুভূম সম অধুকের হৃদয়ক্ষেত্র তরঙ্গোচ্ছ্বাসে উচ্ছসিত হইয়া উঠিল; সেই উচ্ছসিত হৃদয়ে এক পবিত্র সন্নিংসঙ্গম কুটিয়া উঠিল।

অন্তোন্তপ্রতিধাত-সঙ্কলচলৎকল্লোলকোলাচলৈ

কতালান্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সন্নিংসঙ্গমাঃ।

রামচন্দ্র অগস্ত্যশ্রম অভিযুখে বাজ্রা করিলেন।

## তৃতীয়াঙ্ক ।

সুন্দরা দাক্ষিণাত্যের ক্ষুদ্র নদী; গোদাবরী উদ্দেশ্যে বহিয়া চলিয়াছে। ও ক্ষুদ্র নদী নহে—ও যে অগস্ত্য-পত্নী গোপামুদ্রার প্রেরিতা সখী, নিষ্ঠা জনী। গোদাবরীর নিকট দূতী হইয়া সংবাদ লইয়া বাইতেছে। নদীর অধিভারীদেবী দূতী ধরিয়া যানবী হইয়াছে। কবির ঐশ্বর্য্যালিক শক্তি অত্যন্তে চৈতন্যময়ী করিয়াছে, অচেতন প্রাণের প্রতিষ্ঠা আনিয়াছে।

## উত্তরচরিত

পশ্চিমধ্যে অপর একটি নদী—“তমসা” আসিয়া মিলিল; দেবনদী পাতাল-পর্ন্ত ভেদ করিয়া গোদাবরীতে আসিয়া মিশিয়াছে। তমসা অপেক্ষাকৃত বড় নদী, প্রকৃতি বড় ধীর; মুরলার মত চপলা নহে। মুরলা বালিকা, তমসা প্রবীণ। তমসাও আজ শরীরিনী; ভাগীরথীর বরে অদৃশ্য। তমসা সীতার অপেক্ষা বয়সে বড়, মাত্রেও বড়, অভিন্ন-হৃদয়া জ্যেষ্ঠ। ভগ্নীর মত। সীতার উপর তমসার বড়ই স্নেহ। তমসার উপর সীতার বড়ই প্রজ্ঞা। পাতালবাসিনী তমসা ভাগীরথীর আজ্ঞায় সীতার সখী বা সহচারিনী হইবার জন্য পঞ্চবটীতে চলিয়াছে।

দ্বাদশ বৎসরের পর রামচন্দ্র পঞ্চবটী দর্শনে আসিতেছেন। অগস্ত্যদেবের আশীর্বাদ ও লোপামুদ্রার নিম্নালা মাথায় করিয়া অগস্ত্যশ্রম কইতে করিতেছেন। লোপামুদ্রা রামচন্দ্রে বড়ই স্নেহবতী, আর স্নেহও স্নেহ-পাত্রের সর্বদা অনিষ্টাশঙ্কী। করুণাময়ী দেবীর ভয়—রামচন্দ্র পঞ্চবটীর “বধুসহবাস-বিজ্ঞপ্ত সাক্ষী” স্থানগুলি দেখিয়া পাছে মোহ বান, অতি গভীর শোককোভের সংবেগে পাছে তাঁর কোন প্রমাদ ঘটে—তাই গোদাবরীর উপর আদেশ হইল—

“গোদাবারি, তুমি ধারে ধারে পল্পপরাগ-সুব্রতি, “শীকরকণা-নীতল” ভরজ-বাণাদ দিয়া রামচন্দ্রের মুচ্ছিত জীবন তর্পিত করিও।”

রত্নকুলদেবতা গঙ্গাদেবীর ভয় আরও অধিক। তাই তিনি সরস্ব-ধূরে রামচন্দ্রের জনস্থান আগমনের কথা শুনিয়া গৃহাচারচ্ছলে সীতাকে লইয়া আসিয়াছেন। “শোকমাত্র-দ্বিতীয়” রামচন্দ্রের পঞ্চবটী দর্শনে যদি কোন অনর্থ ঘটে, আর সীতার দ্বারা সহজেই সে অনর্থের নিবারণ হইতে পারিবে। সীতাই যে রামচন্দ্রের মৌলিক সঙ্গীকনোপায়।

পাতালবাসিনী সীতা অবনীপৃষ্ঠচরিনী হইয়াও ভাগীরথীর বরে আজ সর্বভোগ্যেরও অদৃশ্য। দ্বাদশবৎসরব্যাপী প্রতিবিম্বিত সীতার সেই প্রতিবিম্ব

কপোল পাণ্ডুর ও দুর্বল হইয়া গিয়াছে ; সেই কুণ্ডিত কুন্তল বিলাল হইয়া মুখে ও চক্ষুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—দোঁধিলে মনে হয়, যেন করুণ রসের মুক্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে, বিরহব্যথা শরীর ধরিয়া দেখা দিয়াছে। সীতার সেই সুকুমার দেহখানি আজ হৃদয়কুহুমণে বী দীর্ঘ শোকে বৃষ্টিচূত কিশলয়ের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে ; সে ক্ষীণ পরিণাম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বর্ণদেহ কেতকী-গর্ভদলের নীলিমা লাভ করিয়াছে।

তৃতীয়াঙ্কের বিফলক শেষ হইল। এইবার মূল তৃতীয়াঙ্কের বনিকা উঠিল। এই অঙ্কে মর্ত্যমানবের অনুশ্রা হইয়া সীতা পঞ্চাটতে সঙ্করমাণা—তাই ইহার আর একটি নাম ছায়া-অঙ্ক। রামের হৃদয়হা, প্রেমময়ী সীতার স্মৃতি যেন আজ প্রত্যক্ষ-দর্শনাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে ; “ভাবনা-প্রেক্ষাৎ স্মৃতিদর্শনরূপতা ইতি (রামানুজ ভাষ্য)। কবি-কল্পনা চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

নেপথ্য হইতে—“প্রমাদ প্রমাদ” কি অনর্থ, কি অনর্থ—এইরূপ আর্ন্তনাদ উখিত হইল। পুষ্পচরনবাগ্নী সীতা অমনই “সকরণোৎসুকো” সেই শব্দ লক্ষ্যে কর্ণ পাতিল।.. আহা স্বহস্তপোষিত করিশিত আজ মদমত্ত গজবাজ কর্তৃক আক্রান্ত ; স্নেহবাকুলা সগন্ধমে করপদ ছুটিয়া গেল। কি সুন্দর! সেই শল্পকীপল্লব-গ্রহণে ব্যাকুল করিশিতকে সীতার মনে পড়িল ; চকিতে ‘বিছাৎসুরণবৎ বনবাসস্মৃতি জাগিয়া উঠিল ; সীতা উদ্ভ্রান্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “আর্য্যপুত্র, আমার পুত্রকে বাঁচাও।” বার বৎসরের ব্যর্থতার পূর্ণ হইয়া গেল! তন্ময়তার অতীত বর্তমানবৎ প্রতীত হইল।

‘কোঁকর আর্য্যপুত্র’ !! তন্ময়তা ছুটিয়া গেল। অতীত—অতীত হইয়া গেল। বর্তমান—বর্তমান হইয়াই দেখা দিল। সীতা তখন সেই জটিল-বিপর্য্যাসে মুহুঁতা। এমন সময়ে জলন্তা মেঘের ধ্বনির মত

## উদ্ভবচরিত

এক গম্ভীর মাংসল নিনাদ সীতার কর্ণবিবর ভরিয়া উখিত হইল; সীতার মুখ। অমনই ছুটয়া গেল। বহুদিনের পর ভাবাবেশও ক্ষত আর তাহার অতীতানও ক্ষত। বড় আশ্বাসে বড় আহ্বানে সীতা মেঘধ্বনি শ্রবণে ময়ূরীর মত চকিতা ও উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিল। সীতা-বল্লভের দুঃগত, অপরিচ্ছূট (সীতার কাছে বড় পরিচ্ছূট) ধ্বনি শুনিয়াই সীতা জানিতে পারিল—আধাপুত্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত।

তমসার মুখে তখন সীতা শুনিল—রাজকর্তব্য পালনের জন্ত রামচন্দ্র জনস্থানে সমাগত হইয়াছেন। সীতাবল্লভ রামচন্দ্রের এই কঠোর রাজ-কর্তব্য পালন দেখিয়া—সীতার বড় আনন্দ হইল। “দিষ্টা অপরিপীণ-রাজধর্মঃ খলু রাজা”—এইস্থানেই সীতাচরিত্রের একটি অনন্তসাধারণী বিশিষ্টতা। রামচন্দ্র যে রাজকর্তব্য যথাযথ পালন করিতেছেন ইহাতেই সীতার আনন্দ! যে কঠোর কর্তব্য পালনের জন্ত রামের সীতা বিসর্জন—সে কর্তব্য পালিত না হইলে এই কষ্ট ভোগই যে বৃথা হয়! রামের শ্রবণে সীতার অগাধ বিশ্বাস,—নচেৎ সীতাকে রাম সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন, তাই রাজকর্তব্যের কঠোর দায়িত্ব বহন করিতে পারিতেছেন—বলুঃ এ বিশ্বাস সীতার নাই; আর এমন ধারণা জন্মিলে সীতার মুখে “দিষ্টা” একথা শুনিতে পাইতাম না। নিঃসঙ্ক—তথাপি রাম তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন; লোকচক্ষুতে কলঙ্কিনী-মত করিয়া অরণ্যে বিসর্জন দিয়াছেন—এ কারণে যে অভিমান—তাহা অবশ্য সীতার বুক ভরিয়াই আছে। এই লজ্জাকর ব্যথা অবশ্য মর্ম্মহলে শেলের মত বিদ্ধ হইয়াই আছে। “দিষ্টা অপরিপীণ-রাজধর্মঃ খলু রাজা” এই কথাটিতে—ঐ অভিমান, ঐ ব্যথা নাই বা কোন প্রকার স্নেহের উদ্বিগ্নতটুকু নাই; ইহা উদার হৃদয়ের স্বতোনিহিত বাণী। রাম শোকে দুঃস্থান হইয়া রাজকর্তব্য হরত ঠিক পালন করিতে পারিবেন না, এমন আশঙ্কা সীতার

ছিল। কর্তব্যচূড়িতর বে শঙ্কা কাটিয়া গেল; ইহাতেই সীতার আনন্দ।  
রাম অল্পজ্ঞেয়িত মুহূর্তে সীতার সম্মুখে যখন বলিতে পারিয়াছেন যে,  
“লোকারাধনার নিমিত্ত আমি স্নেহ, দয়া, বন্ধুত্ব (প্রীতি) এমন কি  
জানকীকে পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি,” আর আজ রামের যোগ্যপত্নী  
সীতাপ্রিয়ী সীতাও তখন না বলিবেন কেন—(ভাগ্যবশতঃ) “দিত্যা  
অপরিকীর্ণরাজধর্মঃ খলু রাজা”।

পঞ্চবতীর সেই চিরপরিচিত তরলতা, সেই স্বহস্তপালিত পশুপক্ষী,  
সেই করুণাদ্রাবিতা গোদাবরী, সেই “বহু নিব্বার-কন্দর” গিরিভট;—  
রামের অন্তর্লীন হৃৎখণ্ডি উদ্দামভাবে জলিয়া উঠিয়া মুচ্ছার সৃষ্টি করিল;  
মুচ্ছা দশনে সীতা “ভগবতি আমার আর্ধ্যপুত্রকে বাঁচাও” বলিয়া  
তমসার পারে পড়িল। তমসা আজ্ঞা করিল “তোমারই প্রিয়-পাণিন্সর্শে  
জগৎপতি রাম বাঁচিবেন।” “বহুবতু তত্ত্ববতু যথা ভগবতী আজ্ঞাপরতি”—  
যাহা হউক তাহা হউক—যাহা ভগবতী আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা করি।  
এখানে বিভ্রাসাগর মহাশয় অর্থ করিয়াছেন “আমার পাণিন্সর্শে আর্ধ্যপুত্র  
বাঁচিবেন কিনা, জানি না, তবে যখন ভগবতী (তমসা) আদেশ করিতে-  
ছেন, তখন তাঁহাকে আমি স্পর্শ করি \*। বহুমবাবু এই অর্থের জন্য  
বিভ্রাসাগর মহাশয়ের উপর অতি তীব্র শ্লেষ করিয়াছেন—“স্বয়ং বিভ্রাসাগর  
মহাশয় যখন বুঝিতে পারিলেন না, তখন বহু মাথু কি বুঝিবেন !”

বহুমবাবু বলেন—“রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার ?  
রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন—বিসর্জন করিবার সময় একবার ডাকিয়াও  
বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। আজি বারো বৎসর  
আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ-রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার

প্রিয়পত্নীর অধিকারে তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! বাহা হউক, তাহা হউক, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করি।” ইহা ভাবিয়া সীতা স্পর্শ করিল, রামও চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। এ ক্ষেত্রে বন্ধিমবাবুর অর্থের পরিপোষক প্রমাণ এই যে, তৎপরেই সীতা বলিলেন “ভগবতী তমসে, এস আমার কিরিয়া বাই। যদি ইনি (রাম) আমাকে দেখিতে পান, তবে এই অননুজাত আগমনের জন্ত (স্পর্শ ত দূরের কথা) আমার মহারাজ কুপিত হইবেন”।

অবশ্য বন্ধিমবাবুর অর্থটি হস্ত সমালোচনার বিচারে ভালই প্রতীতি হয়। বিজ্ঞানাগর মহাশয়ের মতটিও আর-একদিক দিয়া সমর্থন করা যায়। রাম মুচ্ছিত—এমত সঙ্গীনসময়ে অত মান অভিমানের তর্ক উঠিতে পারে না। “বাঁচবেনচ” এমত নিশ্চিত বিশ্বাস সীতার থাকিতে পারে না। তবে ভগবতী আদেশ করিতেছেন, তখন স্পর্শই কর্তব্য। সীতাকে তখন তমসা যে আচ্ছাদিত করিবে, না ভাবিয়া চিন্তিয়া সীতা তখনই তাহা করিতে প্রস্তুত। রামের জীবন শঙ্কটাপন্ন, সে সময়ে সীতার মনে ঐ অভিমানোত্তিত বিতর্ক না উঠিবারই কথা। পরে যখন রাম জীবন পাইলেন, তখনই “অননুজাত পরিধান-জন্য” শঙ্কা হইল। শঙ্কা, চেতনা লাভের অগ্রা নহে। তারপর, হরিচন্দন পল্লবের প্রলেপবৎ চিরপরিচিত স্পর্শ রামের অঙ্গে নিস্পীড়িত চন্দ্রকিরণ-রসের সেক দিল। স্পর্শ চিত্তের সঙ্গীবন অথচ মোহকর; সুহৃদের মধ্যেই সন্তাপন-সুখী নাশ করিয়া আনন্দের জড়তা আনিয়া ফেলিল। মুক্তিমান এসাক্ষের মত এই রেহার্স-সীতল স্পর্শ কি ভুলিবার? কোথায় গিয়ে আনন্দি, কোথায় আমার সেই আনন্দনারিনী দেবী প্রতিমা? রাম চাম্রিককে চাহিয়া দেখিলেন—“কোথায় প্রিয়তমা!” হারামুক্তি ভাগীরথীর করে যে রামের অনুরাগ! রাম তখন ভাবিয়া, লইলেন—“নিজেরই প্রগাঢ় চিন্তা

আজি মূর্তি ধরিয়া তাহাকে প্রতারণা করিয়া গেল। ইহা তদন্তজনিত  
‘একটা ভ্রান্তিমান’।

সীতার স্বকরণালিত সেই করিশিও মদমন্ত গজরাজকে পরাজিত  
করিল। আনন্দে সীতা সেই সন্তানকে আগীর্ষাদ করিল—দীর্ঘায়ু বৎস  
আমার—সৌম্যদর্শনা প্রিয়ার সহিত দেন অবিস্মৃত থাকে। বিরহেই  
সীতার বত ভর। একে পতিবিরহ—তাহাতে আবার পুত্র-বিরহ।  
রামারণের সীতাকে কেবল পতিবিরহই সহ করিতে হইয়াছিল।  
অবহুতির সীতার দুই প্রকার বিরহই সমভাবে ভোগ হইতেছে। উত্তর  
চরিতে সীতা পাতালে মাতার নিকট অবস্থিতা ; পুত্রের স্তন্যত্যাগের পর  
হইতেই বাস্তবিক আশ্রমে প্রতিপালিত। (রামারণে, বাস্তবিক-আশ্রমেই  
সীতা সপুত্রক অবস্থিত করিত)।

কদম্ব-শাখার উন্নতশিখ, মণিময় মুকুটের মত প্রিয়া-সমেত একটা ময়ূর  
বসিয়াছিল। সেই সময়ে কি জানি কেন, সে স্বভাবসিদ্ধ কেকারবে  
জাকিয়া উঠিল। বাসন্তী দেখিল—সীতার সেই পালিতপুত্র ময়ূর-শিখ !  
সীতা দেখিয়াই চিনিলা। রামের নেত্রে অতীতের ছবিটা ভাসিয়া উঠিল,  
—সীতা ক্ষুদ্র করতলে করতালি দিতেছে, আর সেই ময়ূর-শিখটা  
সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে, আবার সেই নৃত্যের সঙ্গেসঙ্গে  
সীতার চক্ষুপন্নবও কেমন স্নন্দরভাবে ঘুরিতেছে ও ফিরিতেছে। সীতার  
সব্বস্মরণিত কদম্ব-বৃক্ষে দুই চারিটা ফুল ফুটিয়াছে। সেই বৃক্ষেই  
সীতার পালিত গিরিময়ূরটাও আশ্রয় লইয়াছে। রাম দেখিলেন—পক্ষী-  
জাতিও পরিচয় স্বরূপ করে এবং স্নেহের মধ্যমা রাখে। আর তিনি—  
শ্রেষ্ঠতম মানব হইয়াও কি করিলেন ? রাম কীদ্বিতে লাগিলেন।  
বাসন্তী ভেদন কদলীবন-মধ্যবর্তী একটি শিল্পাতল দেখাইয়া রামকে  
বলিতে বলিল। চতুর্দিকে সীতার সেই প্রিয় হরিণের দল আজিও

## উত্তর চরিত

তাহারা চরিত্রা বেড়াইতেছে। এইখানে বলিয়াই—না—সীতা তাহাদের কত আদর করিয়া থাকাইত। কানিতে কানিতে রাম সে স্থান ছাড়িয়া অন্ত্র বাইরা বসিলেন।

সখী বাসন্তী সীতার পূর্বস্মৃতি উদ্রেক করিয়া রামকে কান্দাই-  
তেছে, আর মনভাগিনী সীতাও পাখাণীর মত তাহা সহ্য করিতেছে। সেই  
পঞ্চবটী, সেই প্রিয়সখী বাসন্তী, সেই “বিবিধবিশ্রমসাক্ষী গোদাবরী-  
কাননোদেশ”, সেই পুত্রনির্কিংশে পণ্ডপক্ষী, তরুলতা—এ সকল থাকিয়াও  
(সীতার কাছে) নাই। সীতা আর সীতা নহে। মর্ত্যের পতি-  
সোহাগিনী—রাজরাণী আজ পাতালবাসিনী, বিবাহিণী ও ভিখারিণী  
রাজরাজেশ্বরী আজ হার ছায়ামাত্র-ধারিণী ! এদিকে বিকলোদ্ভিন্ন, পাণ্ডুবর্ণ  
ও শোকহরল রামের অবস্থা দেখিয়া অভাগীর চক্ষু জলে ভরিয়া  
উঠিল। সীতা সেই অশ্রুপতনোদগমের অন্তরালেই রামকে সতৃকনয়নে  
দেখিতেছিল। সীতার সেই রেহ-নিঃশুন্নিনী দৃষ্টি কখন স্নেহে, কখন  
দুঃখে, কখন বা শূন্যতার অশ্রুধরণ করিতেছে ; দর্শনভুজার সে দৃষ্টি উদ্ভান-  
দীর্ঘা, বিফারিতা ও দীর্ঘবৎসরীতা। স্নেহময়ী তমসা দেখিল—সে দৃষ্টি  
হৃদয়দীর পরোধারার হৃদয়েথরকে জ্বলন করাইতেছে। তখন বাসন্তী  
জিজ্ঞাসা করিল—“মহারাজ, বাহাকে—আমার প্রাণ, আমার দ্বিতীয় হৃদয়,  
নয়নের জ্যোৎস্না, অঙ্গের অমৃত” এইপ্রকার শতশত বাক্যে ভুলাইতেন,  
সেই যুগ্মা সীতাকে, (১)—বলিতে বলিতে বাসন্তী মুচ্ছিতা হইয়া পড়িল।  
এই বক্তব্যটী শেষ না করাই এখানে সৌন্দর্য্য ! অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে  
নানপদতা স্থান-বিশেষে একটি গুণ। মুচ্ছাভঙ্গের পর বাসন্তী উত্তরে তুলিল  
—“লোকে বে সই করিল না” অর্থাৎ আমি রাজা, প্রজার প্রতিনিধি ;  
প্রজাদের বধন সহ্য হইল না, কাজেই আমিও সেই মতেই চলিয়ায়।

\* বক্তব্য ছিল, বিবর্তন বিনোদ।



এতদিন রামের মনে এই আশ্বপ্ৰসাদ ছিল যে, তিনি প্রজার মতই চলিয়া প্রকৃতরঞ্জন করিয়া বশোভাগী হইয়াছেন। সেই আশ্বপ্ৰসাদের উপরই বাসন্তী আঘাত দিল, জানাইল—

“অগ্নি কঠোর। বশ কিং তে প্রিয়ঃ কিমবশো নহু যোরমতঃপরং।”  
অগ্নি কঠোর, বশ এত আপনার প্রিয়; আর এটী সীতা, বিসর্জন  
অবশ কতদূর হইল, তাহা কি জানেন? সীতা প্রাণের প্রাণ, সে, প্রিয়  
হইল না; প্রিয় হইল, কি, না—বশ। ওহে বশোলোলুপ, সীতা-বিসর্জনে  
কি, আপনার বশ হইল, না—অবশই হইল? বাসন্তীকে এত বড় আঘাত  
করিতে দেখিয়া সীতাও তাহাকে দারুণা ও কঠোরা বলিয়া অনুযোগ  
না করিয়া পারিল না। “হরিণনয়না অভাবভীক সীতার বনে কি অবস্থা  
হইল”—(বাসন্তীর) এই প্রশ্নের উত্তরই রাম দিলেন। যে আশ্বপ্ৰসাদ  
কুণ্ড হইল—সে বিষয়ে আর কোন কথা হইল না।\*

“সখি কি আব মনে করিব? সেই (১) “ত্রৈলোক্যহারনকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টি”  
সেই “পরিপুষ্কিত-গর্ভভালসা” জানকীর, “মুচুমুক্ষ-মৃণালকরা জোৎস্নাময়ী  
অঙ্গলতিকা” নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসদিগের দ্বারা চিরদিনের মতই বিলুপ্ত হইয়াছে।”  
আশ্বপ্ৰসাদও নষ্ট হইল, সীতাও চিরদিনের মতই গেল। তবে কি রহিল?  
মুক্তকণ্ঠে রাম তখন রোদন করিয়া উঠিলেন। হৃদয়টী বিদলিত হইয়া  
বাইতেছে, তথাপি দ্বিধা হইয়া ভাবিয়া বাইতেছে না। অরুণাঙ্গ সারা অঙ্গ  
দগ্ধ করিতেছে অথচ একেবারে ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে না। কি কষ্টকর  
অবস্থা!

বাসন্তী কাতরতার পরাকাষ্ঠার উপনীত দেখিয়া রামকে ধৈর্য্য ধরিতে  
কহিলেন—রামের শোকসাগরের অতিগভীর আবর্ত বাসন্তী দ্বির বাধিতে  
চাছিল। রাম ত শুনিয়া স্তম্ভিত। সীতাপুত্র বাসনবৎসর অতিক্রান্ত

## উত্তরচরিত

হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সীতার নামটিও পৃথিবীতল হইতে লুপ্ত হইতে চলিল,—তথাপি রাম আজও বাঁচিয়া আছে। এ অপেক্ষা হিরণ্যাক্ষর কাহাকে বলে? ধৈর্য্য আর কাহার নাম?

সীতার সব দুঃখ গেল। অভাগীর পরে এত প্রেম, অভাগীর জন্য আর্ষাপুত্রের এত কষ্ট! আর এ নির্বাসন সার্থক! রামের এই প্রেমগর্ভ প্রিয়বচনে সীতা মোহিতা হইয়া পড়িল। তমসা দেখিল, সর্বনাশ! এখন সীতাকে এ স্থান হইতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াই যে দুঃখ হইবে, আর সীতাও কি ইহার পরে ধৈর্য্য ধরিতে পারিবে? রামই এত অধীর, সীতার কাছে সংযম আশা করাই যে তবে বুধা? বৎসলা তমসা সীতাকে রক্ষা করিতে যত্নবতী হইয়া বলিল—

“বৎসে, নৈতাঃ প্রিয়তমা বাচঃ স্নেহার্জীঃ শোক-দারুণাঃ।

এতাস্তা মধুনোদারাস্যোতস্তি সবিবাস্তরি” ॥

বৎসে, এ বড় মনোহারী বাক্য নয়! এ স্নেহে আর্জি বাটে কিন্তু শোকে দারুণ; তোমার কাছে ইহা বিযমিশ্র মধুর ধারা।

বাসন্তী দেখিল, রামের হৃদয় অতীব নিষ্কল্মষ অথচ স্তম্ভিত; আবেগে একেবারে আত্মহারা। সীতা-বিষয়ক প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরে রাবের মনকে লইয়া বাইতে পারিলে একটু দূর হইতে পারিবে—সেই আশায় বাসন্তী রামকে তখন জনস্থানের অন্যান্য ভাগগুলি দেখাইতে লাগিল। সকল ভাগেই যে সীতার ছবি, সকল স্থানেই যে সীতার স্মৃতি! বাসন্তী দুঃখেই উদ্দীপক স্থানগুলিকে বিনোদের উপায় বলিয়া মনে করিল। বাসন্তী ভুক্তভোগিনী নহে; নিজে ভুগিয়া যে অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহা তাহার জন্মে নাই—তাই সে ভুল করিল। সীতা টেকিয়া দিবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে—কাজেই তাহার কাছে সে ভুল ধরা পড়িল। বাসন্তী যে ইচ্ছাপূর্বক রামকে কষ্ট দিবার জন্য জনস্থানের অন্যান্য ভাগগুলি

দেখাইতে লইয়া-বার নাই—তাহা তাহার স্বগতঃ উক্তিতে সুস্পষ্টই বুঝা যায়—“কষ্টমত্যাপরো দেবঃ, তদাক্ষিপামি তাবৎ”

বাসন্তী একটি লতাগৃহের দ্বারে রামকে লইয়া দেখাইল, ঐ সেই,—

অগ্নিস্নেহ লতাগৃহে হুমতবস্ত্রমার্গদন্তেকণা

স্না তঃসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্ গোদাবরীসৈকতে

আগন্ত্যা পরিহর্ষনামিতমিব স্বাং বীক্ষ্য বহুস্বয়া

কাতর্ঘ্যানদরবিন্দকুদ্রলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ ।

সীতার সেই সুন্দর মূর্তিটি—কাতরতানিবন্ধন সেই মুগ্ধ প্রণামাঞ্জলি—রামের চক্ষুতে সুস্পষ্ট ছুটিয়া উঠিল। প্রতিপদে কেবল হৃদয় লইয়া ঘাত প্রতিঘাত ; মনস্তত্ত্বেরই হৃদয় বিশ্লেষণ ; আদিকরণেরই অপূর্ণ লহরীলীলা !

রাম পাচ ভয়ভাবশে চারিদিকেই সীতার মূর্তি দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতার স্মৃতি আজ মূর্তি ধরিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। রাম তাহাকে ( আবছায়া রকমে ) পাইয়াও পাইতেছিলেন না। প্রেমবিহ্বল ভাবপ্রবণ রাম, সীতার স্মৃতিচিহ্নের মধ্যেই তাহার ছায়াটি প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। বলিলেনও তাই, “চাণ্ড জনাকি, তুমি চারিদিকেই আমাকে দেখা দিতেছ ; তবে অনুকম্পা করিতেছ না কেন ?” সীতা যেন অভিমানবশে রামকে দেখা দিয়াও ধরা দিতেছিল না। প্রণয়কোপে কোপনা হইয়াছে বলিয়াই সীতাকে রামের “চণ্ডী” এই লেখাধন।

রাম চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—সীতা নাই। তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল, দেহের বন্ধন স্রব হইয়া আসিল, নিখিল চরাচর শূন্যবৎ প্রতীত হইল। তখন রামের বিকল অন্তরাখ্যা অবসর হইয়া গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল ; দারুণ মোহ চারিদিক দিয়া তাহাকে ছাইয়া ফেলিল। রাম মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

সীতাও মুচ্ছাপ্রাপ্ত। তন্ময়র মুখে “তাহার পাণিস্পর্শই রামচন্দ্রের

## উত্তরচরিত

জীবনলাভের একমাত্র উপায়—ভূনিয়া সীতা সসঙ্গমে রামের হৃদয় ও ললাট স্পর্শ করিল। ইহা দ্বিতীয়বার স্পর্শ—কাজেই মনে আর কোন সন্দোহ, ভয় বা ভাবনা কিছু নাই। রামেরও চেতনা ফিরিয়া আসিল। সেই স্পর্শের মাদকতায় বিভোর রামচন্দ্র আনন্দ-নিমীলিত নয়নেই বাসন্তীকে কহিলেন—“সখি বাসন্তি, কি আনন্দ! জ্ঞানকীকে পাইয়াছি।” কিন্তু গাঢ় তন্দ্রাতাজাত বিভ্রান্তিতেও কদাচিৎ এমত অবস্থা ঘটিতে পারে। অবশ্য এখানে ছায়াসীতাই কারণ, বিভ্রম নহে। ভালবাসার অমৃতময় সুখ-স্পর্শে সীতার বহুকালের স্তম্ভাপ কোথায় চলিয়া গেল; বেদসিক্ত বাহু, বজ্রলেপবদ্ধ—অবশ হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন স্বেচ্ছাস্পর্শ, অমৃত-সীতল বহুগধর সীতার বাহুটী রাম অনায়াসেই ধরিয়া ফেলিলেন। সেই ললিতলবলোপল্লববৎ সুকুমার, সেই তুবারকরকাসদৃশ সুশীতল, চিরপরিচিত বাহুর স্পর্শে রামের ইন্দ্রিয়, আবেশে শিথিল ও জড় হইয়া আসিতে লাগিল। যেমনই রাম—“সখি বাসন্তি, এই ধর” বলিয়া তাহাকে বাহুটী ধরিতে বলিলেন, সীতা অমনই সসঙ্গমে সে বাহুটী সরাইয়া লইল। রাম অহুভব করিলেন, জড় হইতে যেন সহসা জড় খসিয়া গেল।

রামের স্পর্শ—বহুদিনের পর সেই আবেশময় স্পর্শ—সীতাও জ্ঞান হারাইল। চক্ষু দুইটী আবেশে মুদিয়া আসিল, ইন্দ্রিয় স্রব হইয়া গেল; সেই দুর্বল মুহূর্ত্তেই রাম সীতার বাহু ধরিয়া ফেলিলেন। তখন দুইজনের স্পর্শে দুইজনেই বিভোর; সে সময়ে কাহারও চেতনা নাই। সে অবস্থার রক্ত-চলাচল বন্ধই হইয়া গিয়াছিল; চারিটী বাহুই অবশ হইয়া ভাবাবেশে জীবৎ কাঁপিতেছিল মাত্র। যে সময়ে সেই স্পর্শকীৰ্ত্তি ঘটিল, তখন রাম অহুভব করিলেন “জড় হইতে জড় খসিয়া গেল।” স্পর্শকালে কিন্তু জড়ে জড় ছিল বা কল্পবানে কল্পবানু কিছু ছিল—এ উপলব্ধি ছিল না। সীতা সরিয়া গেল, আর রামের অঙ্গকূটিত, ক্রিমিত

চক্ষু হঠাৎ চতুর্দিকে সীতার অমূল্যদানে বুথাই ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তমসা বর্ণনার ভিতর দিয়া এইখানেই সীতার একটা সুন্দর ছবি ফুটাইয়া উল্লসিলেন। একটু হাসির সহিত, একটু কোহুকের সহিত তমসা সীতার পানে রেহভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—

স্বেনয়োমাক্ষিত-কম্পিতাক্ষী জাতা প্রিয়স্পর্শহুধেন বৎসা।

সকরবাস্তঃপ্রবিধৃত-সিক্তা কদম্বযষ্টিঃ ফুটকোরকেব ॥

সীতা স্বেনজলাসিক্তা, কদম্বযষ্টিও নবজলসিক্তা। সীতা রোমাক্ষিতা, কদম্বযষ্টিও ফুটকোরকা। সীতা কম্পমানা, কদম্বযষ্টিও বাহুচালিতা। বৎসা সীতাই আজ কদম্বযষ্টির অবস্থায় উপনীতা। গুরুজনের মুখে কদম্বযষ্টির সহিত আপনার তুলনা শুনিয়া সীতা বড় লজ্জা প্রাপ্তা হইল। ভগবতী কি ভাবিবেন? যিনি আমাকে-কলঙ্কিনীরূপে দেশের কাছে দাঁড় করাইয়া নির্বাসিতা করিলেন—তাঁহার উপর এখনও এত অনুরাগ! সীতা বড় কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িল। তাহার নারীজন্ম তাহারই অজ্ঞাতে কিছু কুণ্ঠিত, আত্মসম্মান একটু আহত হইয়া পড়িল। তবে গাঢ় ভালবাসার কাছে ও সমস্ত তুচ্ছবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। ও সকল কেনা বুধুদের মত উপরে ভাসিয়া থাকে মাত্র।

রাম কিছু বুঝিতে পারিতেছিলেন না! যদি সত্যি সীতা আসিত, তবে বাসন্তী কেন তাঁহাকে দেখিতে পাইল না? তবে কি সে আসে নাই? নিশ্চরই তাই! এ কি স্বপ্ন? কৈ, আমি ত নিদ্রিত নহি! তখন রাম নিশ্চর করিলেন—

সর্বথা স এব অনেকবার-পরিকল্পনা-নির্নিভো বিপ্রলম্বঃ পুনপুনরনু-  
ব্রাভিমাং ( কষ্ট দিতেছে )।

রামের গাঢ় স্থিতি সীতার ছায়া ধরিয়া রামকে মধ্যে মধ্যে ছলনা করিত, আর আজ সীতা সশরীরে ছায়ামূর্তিধারিণী।

## উত্তরচরিত

বাসন্তী রাবণ ও জটায়ুর বৃদ্ধ প্রসঙ্গ তুলিয়া বীরের হৃদয়ে উত্তেজনা-  
আনিবার চেষ্টা করিল। বীরস্বের উদ্দীপনা, দুঃখশোক দূর করিয়া বলই  
আনিয়া দিয়া থাকে। রামের চিন্তে কিছু ফল ফলিল। সীতার অবস্থা কিছু-  
আরও সঙ্গীন হইল,—অতীত দৃশ্য তখন প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাসিত।  
স্মৃতি অমৃততীর আকারে বিবর্তমান। মূহূর্তের জন্ত বিলম্ব ও সন্মোহের  
আবির্ভাব। ভাবাবেগে উন্মত্তা হইয়া সীতা “আর্য্যপুত্র আমাকে রক্ষা কর”  
বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। উন্মত্ততার পরই অবসাদ,  
প্রকৃতিরই নিয়ম। সীতাও শুনিল, রাম বলিতেছেন “এ বিরহ নিরবধি,  
ইহার কোন প্রতিকার নাই”। যেটুকু আশা ছিল, তাহাও নিঃশেষ হইল।  
আশা গেলেই সকল হুয়ার; সীতারও সবই হুয়াইল,—অবসরা সীতা  
“আমি জন্মের মত গেলাম” বলিয়া মুচ্ছিতা হইয়া পড়িল। রাম  
আর কাঁদিতে পারেন না—সীতার স্মৃতিচিহ্নগুলি আর দেখিতে  
পারেন না—তখন তিনি সেইস্থান ত্যাগ করার জন্ত বাসন্তীর নিকটে  
অনুমতি চাহিলেন। রাম চলিয়া বাইতে চাহেন সীতা কিছু উদ্বেগে  
ঝাঙ্কল হইয়া “ভগবতি তমসে, আর্য্যপুত্র যে চলিয়া বাইতেছেন” বলিয়া  
তনসাকে জড়াইয়া রহিল। কি ঔৎসুক্য, কি উদ্বেগ, কি কাতরতা, কি বা  
মোহ! রাম সীতাকে বনে নির্কাসন করিয়াছেন—কাজেই তাঁহার  
পক্ষে সেই স্মৃতি-চিহ্নগুলি দর্শন করা বড়ই কষ্টকর। সীতা ত আর  
নিজে ত্যাগ করে নাই, শত দুঃখের মধ্যেও ইহাই সীতার সাধনা। তত্ত্ব  
তাহার অনুতাপের ও লেশমাত্র কারণ নাই। নিজহস্তে হতপিণ্ডছেদের  
যে কি জালা, তাহা রামই জানেন; সীতা ত আর তাহা জানে না।  
তত্ত্ব রামকে পতিপ্রাণা সীতা চকুর উপর দেখিতে পাইতেছে, রাম কিন্তু  
সীতাকে আদৌ দেখিতে পাইতেছেন না!

সীতা চলিয়া বাইতে চাহিবে কেন? কত কালের পর যে, সীতা

‘আজি প্রাণ ভরিয়া সেই স্থলভদর্শন প্রিয়তম রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছে ; কেমন করিয়া সে, স্পৃগ্নীর এই স্থান ছাড়িয়া যাইবে ? রাম সীতাকে দেখিতে পাউতেছেন না, দেখার বলবতী তুবা উত্তরোত্তর তাঁহার বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাম সীতাকেই দেখিতে চান ! সীতা কোথায় ? অগত্যা, অশ্বমেধযজ্ঞার্থে নির্ম্মিত হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতি দেখিয়া রাম আপনার বাস্পদিগ্ধ চক্ষু তৃপ্ত করিবেন, হির করিলেন।

কি, সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ ! আর তাহা অযোধ্যায় ! অশ্বমেধযজ্ঞে সহস্রাচারিণীর নিমিত্ত ? সীতা কৃতার্থা হইল। পরিত্যাগ জনিত লজ্জাশল্য তাহার হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইয়া গেল। শিথিলবৃত্ত ফলটি পৈর্ষ্যবন্ধনে বদ্ধ রহিল।

সেই হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্তি ধন্য—যে আজ জীবলোকের আশাতরসা হইয়াছে। এ এক আশ্চর্য্য প্রকারের ঈর্ষা ও অহুয়া ! নিজে অধন্য, হত-ভাগিনী কিন্তু আপনার প্রতিমূর্তি আজ কি ধন্য, কি সৌভাগ্যবতী ! নিজের উপর এই সুন্দর ঈর্ষা ও অহুয়ার ভাবটী বড়ই উপভোগ্য।

বালম্ভী রামের অযোধ্যা প্রত্যাগমনের মত দিল। তমসাও সীতাকে বলিলেন “এখন চল বৎসে, আমরাও যাই।” সীতা মুখে বলিল মাত্র, “চলুন যাই”, কিন্তু সে আজ কেমন করিয়া যাইবে ? তাহার তৃকাদীর্ঘ চক্ষু যে, প্রিয়তম রামচন্দ্রে আজ দৃঢ় নিখাত হইয়া আছে।

রামচন্দ্র বিমানে আরোহণ করিয়া অযোধ্যায় চলিয়া যাইলেন। এদিকে সীতাও তমসার সঙ্গে ভর দিয়া ধীরে ধীরে চারুখানির মত চলিয়া গেল। অশরীহিণী স্বতিক্রপা রামের ছায়াই বেন সমুখ হইতে নীরবে প্রস্থান করিল।

এই তৃতীয়াঙ্কে একই করুণরস (আলঙ্কারিকমতে অবস্ত করুণবিগ্রহ-ভাষ্য আদিত্য) নানা “ব্যভিচারী” ভাবের মধ্য দিয়া পৃথক্-পৃথক্ রূপে বিবর্তিত হইয়াছে মাত্র। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই করুণরস

বর্তমান। লজ্জা, নির্বেদন, দৈহিক, জড়তা, ঔৎসুক্য, ভয়, হর্ষ, বিদ্বেষ, শ্রুতি ও নতি প্রভৃতি ব্যক্তিচারী ভাবগুলি একই করুণরসকে বিবিধ আকারে দিরাছে। তাই এই একই করুণরস সারা-তৃতীয়াঙ্ক ব্যাপিরা প্রবহমান থাকিয়া এক অপূর্ণ কবিত্বের বিকাশ করিরাছে। বিশ্ব-সাহিত্যে এ কবিত্বের তুলনা নাই। কোন সমালোচক বলিরাছেন (বঙ্কিমবাবু), নাট্য হিসাবে তৃতীয়াঙ্কের তেমন মূল্য নাই। সে নাট্য কি ইংরেজি? সংস্কৃত নাট্য অবশ্যই নহে। কোথার কোন্ ব্যক্তিচারীভাব কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিরাছে—তাহা চীকার সহিত তৃতীয়াঙ্কটা মিলাইরা পড়িলে সকল পাঠকই বুঝিতে পারিবেন। আর জানিতে পারিবেন, একই করুণম্রোত কিভাবে কত দিক দিয়া বহিরা গিরাছে। কবির সহিত সকলেই এখন একবাক্যে বলিবেন—

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদা  
 ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাদ্রয়তে বিবর্তান্ ।  
 আবর্তবুধুদত্তরসমরান্ বিকারা  
 নভো যথা, সলিলমেকঙ্কু তৎসমগ্রং ॥

কি সাহিত্যচিন্তাবে কিবা নাট্যহিসাবে তৃতীয়াঙ্কের তুলনা নাই।

“রামরাবণরোবুজ্জং রামরাবণরোরিব”

### চতুর্থ অঙ্ক ।

চতুর্থ অঙ্কে বিকটকে সৌমাতকি ও ভাণ্ডারন নামে বাসীকির দুইজন শিশু দেখা দিল। সৌমাতকি পাঠে অমনোবোঁদী, ক্রীড়ায় বাসনী, ব্যবহারে



হুর্কিনীত আর সর্বত্রই অসংবতবাক্ । ভাণ্ডারন তাঁহার বিশ্রীতই ছিল ; বাস্ত্রীকির উপযুক্ত ছাত্র ; কি বেদোচ্ছল বুদ্ধি, কি ভ্রোচিতি ব্যবহার, কি সংবত বাক্, কিবা সংবত মধুর বাণী । ভাণ্ডারনের কথার জানিতে পারা গেল যে, রাজর্ষি জনক সীতার হুর্কিপাকজনিত হুঃখে বানপ্রস্থাপ্রবে চন্দ্রবীপ-তপোবনে এতদিন তপস্যার রত ছিলেন, আর আজ সেই তপোবন-হইতে বাস্ত্রীকি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন ।

রাজর্ষি জনক আজ সীতাশোকে দহমান বনস্পতির অবস্থার উপনীত । সীতার সে নির্কালন-হুঃখে ব্রহ্মবাদী রাজর্ষির মর্ম্মস্থল ছিন্নবিচ্ছিন্ন । সে শোক, সে হুঃখের বিরাম নাই । বশিষ্ঠ ও বাস্ত্রীকির সহিত সাক্ষাৎ শেষ করিয়া ক্রান্ত রাজর্ষি বাস্ত্রীকি আশ্রমে বহির্বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট । অবসাদে ক্রান্তিতে তাঁহার চক্ষু হইল অন্ধ মুদ্রিত । সেই মুদ্রিত চক্ষুর উপর সীতার সেই কঁাদ কঁাদ সুখখানি অস্পষ্ট ভাসমান । একে বার্কাকাতার দারুণ ব্যথা—তার উপর পরাক ও শাস্ত্রপন প্রভৃতি কঠোর ব্রতপালনের কষ্ট, তথাপি বন্ধমেহের বিনাশ নাই । আশ্রমভীর গতি অন্ধতামিশ্র লোকে,—কাজেই ব্রহ্মবাদী ঋষি স্বেচ্ছায় দেহপাত করিতে পারেন না ; অথচ সেই দেহতার আর বহন করাও তাঁহার পক্ষে এখন অসম্ভব ।

মনে পড়ে বধন সীতার সেই নির্কালন দণ্ড, তখন জনকের ঐর্ষ্য আর থাকে না । বনুচ্ছরাপর্ধ্যস্ত কঠোরা বলিয়া অহুযোগের পাত্রী হইলেন । “বনুচ্ছরে, অগ্নি বাহার পবিত্রতার সাক্ষী, সেই স্বতঃপরিজ্ঞা তনয়ার এই কুৎসিত নির্কালন বা হইয়া কেমন করিয়া সহ করিলে ?”

বনুচ্ছরের দ্বাদশবার্ষিক বক্ত আজ সমাপ্ত হইয়াছে । বশিষ্ঠদেব, অন্ধকর্তা ও কৌশল্যাসহ বনুচ্ছরাশ্রম হইতে বাক্সা করিয়াছেন । সেই পুণ্যত্রীলম-ভূজ সীতা নাই ; সে রাজলক্ষী-অধ্যাসিত রাজ্য নাই । রাজধানী এখন শূন্য ; তথার আর স্বপ্ন নাই । কৌশল্যাবির মনেও শান্তি নাই । বশিষ্ঠ

## উত্তরচরিত্র

দেবের অতিপ্রাণ-অঙ্গসারে ফিরিবার পথে সকলে বাস্তবিক আশ্রমে উপনীত। আসিয়া দেখেন, রাজর্ষি জনক তথায় উপস্থিত। হায়, কৌশল্যা কেমন করিয়া রাজর্ষি জনকের নিকট মুখ দেখাইবেন! সীতা পরিত্যক্ত করিয়া রাম যে কেবল রাজর্ষির মাথার বেদনাতার চাপাইয়াছেন তাহা নহে, দারুণ অপমানের বোঝাও চাপাইয়াছেন। নিজের পুত্রের এই আচরণে কৌশল্যা বড় লজ্জিতা, বড় দুঃখিতা। রাজর্ষির সাক্ষাতে বাহির হইতে তিনি চাহেন না। এদিকে বশিষ্ঠদেবের আদেশ, নিজে রাইয়া রাজর্ষি জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। তখন অগত্যা কৌশল্যা রাজর্ষির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কৌশল্যাকে দেখিয়া কে বলিবে যে, সেই কৌশল্যা! দশরথের গৃহের সেই লক্ষ্মী আজি দীনা ভিখারিণীর মত উপস্থিতা; সেই মণিমাণিকা-ভূষিতা রাজরাণী আজি বিধবার সাজে লজ্জিতা। অবস্থার কি পরিবর্তন! জনকের নিকট যে কৌশল্যা একদিন মুর্তিমান্ মহোৎসবের মত ছিল, আর আজি সেই তাহারই দর্শন, কতে লক্ষ্যক্ষেপের মত কষ্টকর দাঁড়াইয়াছে। দশরথের মত আশীর সেই দুঃখকর মৃত্যু, তার উপর স্বতঃস্ফূর্ত সীতার এই অপমানজনক নির্দোষ রাক্ষসীর ও মনকে একেবারে ভাঙিয়া দিয়া গিয়াছে। কলপশ্রম রাক্ষসদান আজ শীহীন, আগাছার পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কৌশল্যার চরণ আর বহে না। কুলগুরুর আদেশ, তাই তিনি কোন মতে আপনাকে ধরিয়া রাখিয়া বস্তু মত অগ্রসর হইতেছেন। হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া হুক হুক কাঁপিতেছে। ভিতরের কথকিৎ-কল্প ব্যথা আজ দ্বিগুণ হইয়া দেখা দিয়াছে। প্রিয়জন-দর্শনে ব্যথা প্রবল হইয়া উঠে, ইহাই মানবের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম; কৌশল্যারও তাহাই হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন,—

দুটো জনে প্রেরণি হুঃসহানি

শ্রোতঃসহস্রৈরিব সংগ্রবন্তে ।

প্রিয়জন সমাগমে হুঃসহ হুঃখ, সহস্র-শ্রোতোধারার দানকে ভাসাইরা  
লইয়া যায় ! কুমারসন্তবে কালিদাসও বলিরাছেন—

“অজ্ঞানানি হি হুঃখমগ্রতো বিবৃতবারমিবোগজ্ঞারতে”

বহুদিনের বিবৃতিতে শোকের উপর যে আবরণ পড়ে, প্রিয়জনের  
সাক্ষাতে সেই আবরণ দূর হইয়া যায় । আবরণই এখানে দায় ।

কঠোর কর্তব্যের নিকট নিজের হুঃখ শোক তুচ্ছ করিয়া কৌশল্যা  
জনকের সাক্ষাতে উপস্থিতা । “স্বামীর প্রাণোপম বদ্ধ, বৎসা সীতার  
স্নেহময় পিতা, নিজের পরমাশ্রয় মুক্ত, সেই রাজর্ষি জনক কি এই ? এই  
“অনুপস্থিত মহোৎসব”—দিনে আমি কিরূপে সম্ভাবিতা হইব”—কৌশল্যা  
দাঁড়াইরা দাঁড়াইরা কাঁপিতে লাগিলেন ।

রাজর্ষি জনক ভগবতী অরুণভীর নিকট বাইরা ভূতলনমিত শিরে  
অঙ্গবন্দ্য্য উবারেবীর মত তাহাকে বন্দনা করিলেন । সে বন্দনাটি বড়  
মধুর । অতীত ভারতে উপবৃত্ত রমণীর মর্যাদা কিরূপ ছিল, তাহার একটি  
চিত্র পাওয়া গেল ।

যরা পূতমন্তো নিধিরপি পবিজ্ঞত মহস:

পতিভ্যে পূর্বেবামপি খলু গুরুণাং গুরুতমঃ ।

ত্রিলোকীভল্যামবনিতললোগেন শিরসা

অঙ্গবন্দ্য্যং দেবীমুবারমিব বন্দে ভগবতীং ॥

লোকে আশীর্বাদ করে, যনে পুত্রে সম্রাট হউক । অরুণভী  
আশীর্বাদ করিলেন “পরমজ্যোতিতে প্রকাশতাম্”—সেই পরমজ্যোতি  
ভেদাতে প্রকাশিত হউক ।

কতকি রাজান্তঃপুরের রক্ষক, বুদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজ । সেই পুরাকাসেও

## উত্তরচরিত

ব্রাহ্মণের দাস। বাস্তবিক এ অধঃগতন কালিদাস ও ভবভূতির  
আমলেরই। রাজর্ষি, কক্কিকে “আর্ষা” সম্বোধন করিয়া তাঁহার সম্মান  
সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও মহাত্ম্যবতা প্রদর্শন করিলেন, “আর্ষা, প্রজাপাল-  
মাতুর্হি কুশলঃ ?” প্রজাপালনের অহুরোধে যে নিজের জীকে, স্বতঃ-  
পরিজ্ঞা সীতার মত প্রিয়তমা পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারে, সেই প্রজা-  
পালক রাজার মাতার কুশল তো ?

কি মর্শাস্তিক উপেক্ষা, কি ভ্রিমিত ওদাসীভ্য ! বিকৃত হৃদয়  
হইতে প্রচণ্ড আলায় একটি গৈরিক উৎস ফুটিয়া উঠিল। কক্কির মনে  
হইল, কৌশল্যার প্রতি ইহা যে কেবল নিষ্ঠুর তিরস্কার করিবার উদ্দেশ্যেই  
জনকের এই উক্তি, তাহা নহে; নিষ্ঠুর পরিহাস বা মর্শভেদী বাজ  
করাই যে তাঁহার অভিপ্রায়, তাহাও নহে। কক্কির এই মামুলী কৈকিরং  
সেওয়ার চেষ্ঠার জনকের হৃদয়ের আলা আরও বাড়িয়া গেল, আত্মমর্ধ্যাদা  
বিশৃঙ্খলভাবে ফুট হইল। একদিন সীতাপতি রামচন্দ্রও লক্ষ্মণকে বলিয়া-  
ছিলেন—“উৎপত্তিপরিপূতা” সীতার আবার শুদ্ধি কি? আর আজ  
সীতাপিত্তা জনকও গর্জিয়া উঠিলেন—

“আঃ কোহরমরির্নাম অশ্রং প্রস্থতিপরিশোধনে”—সীতাই ত আরার  
সুষ্ঠিমতী শুদ্ধি, তার আবার শুদ্ধি কি! রাম ত একদিন অপমান করিয়াছে,  
আবার আজও পুনরায় অপমানিত হইলাম।

অকল্পতী জনকেরই বিশ্বাসের অভিযুক্তি করিলেন। তারপর সীতার  
উদ্দেশ্যে একটি ককণ দীর্ঘনিশ্বাস নিঃসৃত নাসাপুট হইতে উথিত হইল।  
ব্রহ্মবিরহীনা অগম্য। অকল্পতী সীতাকে কি চক্ষুতে দেখিতেন, যেহেতু  
সঙ্গে কি রতীর প্রকা তার উপর পোষণ করিতেন, তাহা প্রকাশ পাইল—

বৎসে,—নিতর্য্য শিষ্টা বা বহসি মম ভর্তির্ভূত তথা

বিত্তদেবকংকর্য্যবহিত মম ভর্তিঃ জনরক্তি।

শিশুঃ শৈশবঃ বা ভবতু নহ বক্ষ্যামি জগতাঃ

গুণাঃ পূজ্যস্থানঃ গুণিহু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ ।

বৎসে, শিশুই হও, আর আমার শিষ্যই হও—তুমি আমার বা, তুমি তাই থাক। কিন্তু তোমার পবিত্রতার উৎকর্ষ তোমার প্রতি আমার ভক্তি জন্মাইয়া দিতেছে। শিশু আর দ্রীঘ বাহাই হউক, তথাপি তুমি জগতের বক্ষনীয়া। গুণই, পূজ্যর প্রকৃত কারণ, লিঙ্গ (দ্রী পুরুষই লিঙ্গ) নহে, বয়সও নহে।

একদিকে জনকের অতঃশুভিত শোক, স্বতঃস্ফূর্ত আলার অভিযুক্তি, আর অত্রদিকে অক্লান্তীয় শান্ত নিরুপদ্রুত মেহ, দ্বিগু কোমল প্রকার প্রকাশ। একদিকে, গৈরিক নদ প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে, অপরদিকে, বননদী দ্বিগু কোমল ছায়াখানি বুকে করিয়া বহিয়া বাইতেছে।

কৌশল্যার হৃদয়ে বাতপ্রতিবাত আরম্ভ হইল—তখন কৌশল্যার মনে পড়িল, সেই প্রাণপ্রিয় পতি দশরথের কথা; সেই রাজর্ষির সহিত অতির হৃদয়ের বন্ধুতা। স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল, সেই শিশুদের কোমল মুখকমলগুলি, সেই অতীতের মধুময়ী ছবি। তখন রাজরাণীর সেই কুসুম-সুসুমার হৃদয়ে বহাদিনের কষ্ট বেদনা জাগিয়া উঠিল। এই দারুণ দশা বিপর্যয় সহ করিতে না পারিয়া কৌশল্যা স্ফুৰ্ত্তিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

রাজর্ষির উপেক্ষা ও ঔদাসীন্ম কোথায় ভাসিয়া গেল। হৃদয়ের সেই উক জ্বালা অকস্মাৎ যেন নির্ঝাপ প্রাপ্ত হইল। তখন রাজর্ষির চিন্তা-স্রোত অস্তধাত্তে বহিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ দশরথ কি ছিলেন? দ্বিতীয় হৃদয়, স্মৃতিমান আনন্দ, প্রাণধারণের বল, না—আর কিছু ছিলেন? শরীর, জীবন—না—তাহা হইতেও প্রিয় কিছু ছিলেন? সেই দশরথের প্রাণ প্রিয়তমা, আমার সেই প্রিয়সখী কি এই! বাহাদেব

## উত্তর চরিত

ভালবাসার আমি সঙ্গী ছিলাম, আনন্দের অংশীভাগী ছিলাম, আর প্রাণের কোপেও বাহাদুরের মুগ্ধভংসনার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতাম,—সেই প্রিয়সখী কৌশল্যার প্রতি আমি কি বৃশংস ব্যবহারই না,—করিলাম।

কৌশল্যা ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিতে লাগিলেন—তাঁহার অর্ধ সূত্রিত চক্ষুদুটি, তখন সীতার মুখপুণ্ডরীক-দর্শনাশার ব্যাকুল; বাহুদুটি, সেই জ্যোৎস্না-কুমার অঙ্গলতিকার আলিঙ্গন-আকাঙ্ক্ষায় ব্যগ্র। মহারাজ দশরথ বলিতেন “সীতা রত্নবংশের বধু, কিন্তু জনকসম্বন্ধে সীতা আমাদের হুহিতা”।

সম্বন্ধের বীজ সীতা নাই; তথাপি দৃঢ় জীবন ত ধায় না! বহুলেপ দিয়া কে যেন প্রাণকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; তাই আর প্রাণ নড়িতে চড়িতে চায় না। রোদনের স্রোত বাড়িয়াই চলিয়াছে দেখিয়া অরুণভী কৌশল্যাকে সাহসনা দিলেন এবং “পরিণাম কল ভালই হইবে” কুলগুরুর এই আদেশটিও স্মরণপথে আনয়ন করিলেন। স্নেহ সর্বদাই বৈকল্যই আশঙ্কা করে; তাই কৌশল্যা বলিলেন—

“ভগবতি, সীতাকে আবার পাইব? সে মনোরথ যে চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে” কৌশল্যার এই কথাই অরুণভীর আশ্বস্তব্যাদা সুর হইল। “সুভকল হইবে” বশিষ্ঠদেবের এই আদেশের উপর তাহার অবিবাস! পতিব্রতা তেজস্বিনী নারী বশিষ্ঠ দেবের মত পতিদেবতার উপর রাজ্যীয় এই অবিবাসের তাব লক্ষ্য করিয়া যেন একটু উত্তেজিতা মত হইয়া উঠিলেন। কিরংকণ পূর্বে যিনি দেহের কোমলা সূক্তি ছিলেন, এক্ষণে তিনি আবার ব্রহ্মণ্য জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়ী, সতীত্বের তেজে তেজস্বিনী। তেজস্বিনী ঋষিপত্নী তখন কৌশল্যাকে কহিলেন—

“তবে কি রাজপুত্রি, বশিষ্ঠ দেবের বাক্য মিথ্যা হইবে মনে করিতেছ? হৃদয়দ্বারে, মনে অস্ত্র প্রকার তাবনা আনিয়ো না, তিনি বাহ্য বলিদায়ক

জাহা অবশ্যই ঘটবে। “সেই আবির্ভূত-ব্রহ্মলোভি” ব্রাহ্মণের বাক্য কখন বিফল হয় না, তাঁহারই বাক্যের উপর সিদ্ধি নিরতই বাস করে ; সে ব্রাহ্মণেরা কখনও বিফল বাক্য উচ্চারণ করেন না। রামচন্দ্রই একদিন অষ্টাবক্র ঋষির “বীরপ্রসব হও” (সীতার প্রতি) এই আশীর্বাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন—

“ঋষীগাং পুনরাভ্যাসাং বাচমর্থোহমুখাবতি” (১মাক)।

নেপথ্যে কল কল রব উথিত হইল। বশিষ্ঠ জনকাদির আগমন-জন্ত বালকগণের আজ ‘শিষ্টানধ্যায়’ ; কাজেই মনের আনন্দে বালকগণ আজি কোলাহুল্য মত্ত। কোশল্যা শোকের মূর্তি। বালকগণের আনন্দ-কোলাহল তাঁহারও চিত্তে একটি অনির্বচনীয় আনন্দ ফুটাইয়া দিল ; তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন, “সুলহ-সৌখং দাব বালমত্তং হোদি” বালাকালে চিত্তার উৎফেল নাই, শোক হুঃখের কোনও কারণ নাই, কাজেই শিশুদের সর্বদাই আনন্দভাব।

সেই বালকগণের মধ্যে একটি বালকের মুখশ্রী সকলকার লোচনপটে ফুটিয়া উঠিল। সেই বালকই লব। তার সেই কুবলয়মল-স্নিগ্ধ ঘন ক্রামবর্ণ, সেই মনোরম কাকপক্ষ চূড়া, সেই সৌষ্ঠবপূর্ণ মুখ ললিত অঙ্গের মধ্যে কোশল্যা রামভদ্রেরই শ্রী প্রত্যক্ষ করিলেন। জনকের মনে হইল, রঘুনন্দনই বেন শিশুরূপে দণ্ডায়মান। এ কে রে ? নরনের অমৃত্যুরজন স্বরূপ এ বালকটী কে-রে ? সপ্তর্ষি-বসিত। অরুণতী ভাগীরথীর মুখে অগ্রেই সমস্ত ব্রহ্ম অবগত ছিলেন। বৎস। সীতার বে ছইটী বয়স পূর, আর জাহারা বে বায়ীকির আশ্রমে নীত, অরুণতী তাহা অগ্রেই বলিয়াছিলেন। এই পুত্রটী বে, সেই বয়স পূত্রেরই অন্ততম, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

অরুণতী এ বালক, এ ভ. ব্রাহ্মণ বালক নহে—এ বোঝাই

## উত্তরচরিত্র:

ক্রমচারী—মকুব বাণপূর্ণ তুণীরঘর পৃষ্ঠে থাকিবে কেন? এদিকে তুলসিগু বন্ধ, পরিধের মুগচর্চ, আবার বাহ্যে কাশ্মুক শোভমান। অক্ষমালা বলর ও অশ্বখদণ্ডের সঙ্গে “তুণীরঘরসহ” শরাসনের মিলন বস্ত্রতই আশ্চর্য্যকর।

লবের ‘বিনয়মন্ত্রণ তেজ, মধুর-মদ্র ব্যবহার, সুন্দর অভিবাচন প্রণালী দেখিয়া সকলেই প্রীতিলাভ করিলেন। অরুণ্ডী লবকে ত একেবারেই কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। শুধু যে তাঁহার কোলই ভরিয়া গেল, তাহা নহে; বহুদিনের অনোরথও সম্পূর্ণ হইল। অরুণ্ডী যে লবকেই সীতার পুত্র জানিয়া কোলে লইয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার ত আনন্দ অনিবার্যই কথা। কিন্তু, কৌশল্যা ত লবকে সীতার পুত্র বলিয়া জানেন না; তথাপি বখন লবের নীলোৎপলস্তায় অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, কলহংস-মিনারবৎ মধুরগম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহাও মনে হইল, বেন শিশু “স্বামভদ্র” আসিয়া কোলে বসিয়া আছে। ভাল করিয়া লবের মুখখানির প্রতি দৃষ্টি করিয়া স্নানের মাতা দেখিতে পাইলেন যে, লবের মুখখানিতে বেন বধু সীতারও মুখখানির ছায়া ফুটিয়া রহিয়াছে। লব পিতার দৈহিকগঠন, কণ্ঠস্বর, বীরোবাস্ত গতি ও অসুভাব-গাভীর্বা লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহার মুখখানী হইয়াছে মাতারই মুখের মত। শাস্ত্রেও বলে, মাতৃমুখ পুত্র সৌভাগ্যবান।

স্রীলোকের প্রকৃতিই এই। তাহারা শিশুরের মাতাপিতার কথাই আগে জিজ্ঞাসা করে। কৌশল্যার ক্ষমরে আশার যে সীতারসিঁটুকু আনিবার উপক্রম করিয়াছে—এরও তদনুসরণ হইবারই কথা, হইলও আই। কৌশল্যা জিজ্ঞাসা করিলেন “জোনার মা আছেন, লবকে মনে পড়ে?” ক্ষমরের অকুট আশা স্নান বাণীভূষণে প্রকাশিত হইলো, মকুব ঘরে বেমার ‘আছেন’? আর বপের বেমার ‘মনে পড়ে’?—



এরূপ প্রশ্ন উঠে কেন? সীতার পুত্র, সীতা কাছেই আছে; রাম ত নিকটে থাকিবেন না। অবশ্য কৌশল্যা যে এই ভাবিয়াই ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহা না হইতে পারে।

লব কিছু জানে না—ভক্ত ত্যাগের পরই তাহারা মাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বান্দ্রীক আশ্রমে প্রতিপালিত। সীতা তাহাদের মাতা, রামচন্দ্র তাহাদের পিতা—ইহা তাহারা জানে না। তাহারা জানে, তাহারা বান্দ্রীকির, “উত্তরও দিন তাই। কৌশল্যা সে উত্তর শুনিতে চাহেন না; মন ইহা চাহে না; তাই তিনি বলিলেন—“বাহা প্রকৃত বলিবার, তাহাই বল।” ভাবটী এই, বান্দ্রীকি ত আর বিবাহিত নহেন যে, তাঁহার পুত্র জন্মিবে।

রামচন্দ্র অযোধ্যার অধর্মের যজ্ঞে ব্রতী। সহস্রচারিণী ব্যভীত অধর্মের যজ্ঞ হর না; তাই হিরণ্যবী সীতা-প্রতিকৃতি পার্শ্বে রাখিয়া রাম অধর্মের-যজ্ঞ করিবেন স্থির করিয়াছেন। অধর্মের-যজ্ঞের অর্থ লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হওয়ারই বিধি। লক্ষণের পুত্র চন্দ্রকেতু দিগ্বিজয়ে অর্থ লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। ঘটনাক্রমে বান্দ্রীকির আশ্রমে অর্থ উপস্থিত। চন্দ্রকেতুও অর্থের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আশ্রমে উপনীত। জনকের সহিত কথোপকথনে লব মহর্ষি বান্দ্রীকীর রচিত রামায়ণের কথা পাড়িল এবং জানাইল—“প্রাপ্তপ্রসববেদনা সীতার ঘনবাস পর্যন্তই প্রকাশিত হইয়াছে।” বান্দ্রীকি-রচিত সংস্কৃত রামায়ণে, পাঁচমাল গর্ভাবস্থার, বান্দ্রীকির আশ্রমের সম্মুখেই লক্ষণ কর্তৃক সীতা বিসর্জিতা হন। কিন্তু ভবভূতি সীতাকে পূর্ণগর্ভাবস্থার গভীর অরণ্যে ভাস্কর্য্যবীতীরে বিসর্জনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, [এ সম্বন্ধে তুলনামূলক সমালোচনা প্রথমাক সমালোচনার ক্ষেত্রেই করিয়াছি।] এবং রামায়ণের কিরকণে লইয়া যে একখানি নাটকও প্রস্তুত হইয়াছে; আর সেই নাটকখানি অভিনয়

## উত্তরচরিত

নাট্যশিল্প ভরতমূৰ্ত্তির আশ্রয়ে প্রেরণও করা হইয়াছে। নিজের কোষ্ঠ ভ্রাতা হুশ সেই নাটকখানি পৌছিয়া দিবার ভার লইয়া সশস্ত্রে বাজাও করিয়াছে।”

ভ্রাতার কথা শুনিয়া কৌশল্যা বেন একটু হতাশ, একটু মুহূমান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার ভাইও আছে!” “ভ্রাতা আছে”— তবে ত সীতার পুত্র হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। তারপর বধন বমল ভ্রাতার কথা শুনিলেন, তখন বেন আবার আশ্রিত হইয়া উঠিলেন।

মিথ্যা জনরবে উদ্বিগ্ন হইয়া রামচন্দ্র পূর্ণগর্ভা সীতাকে অরশ্যে বিসর্জন করিয়াছেন— লবের মুখে এই কথা শুনিয়া কৌশল্যা কাঁদিয়া উঠিলেন। পিতা জনক আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—“উঃ—সেই নিদারুণ পরিত্যাগের অপমান, তার উপর প্রসবের বাধা; আর চারিদিকে হিংস্র বক্তৃতাভর কোলাহল! বৎসা সীতা ভয়ে ভীত হইয়া কতবারই না—আমাকে “রক্ষা কর” বলিয়া স্মরণ করিয়াছিলে? হা বৎসে,

নুনঃ দ্বারা পরিভবক নবক ধোরং তাক্ ব্যর্থাং প্রসবকালকৃত্যামমাপ্য।

ক্রব্যাদগণেষু পরিতঃ পরিবারসংস্থ সন্তস্তয়া শরণমিত্যসক্লংবৃত্তোহস্মি” ॥

জনকের ব্রহ্মময় চকুর উপর সীতার সেই অশরণ অবস্থার ছবি ফুটিয়া উঠিল। অক্লান্তী, কৌশল্যা এবং বিশেষতঃ বালক লবের সম্মুখে রাজর্ষির মাথা কাটা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে পৌরজনের কুম্ভাঘাটা আর রামের “অবিস্মৃৎকারিতাও মনে পড়িল। উঃ—এই অবিস্মৃৎকারিতার কলেই সীতার এই নিমিত্ত নির্বাসন, এই নিদারুণ দশা বিপর্যয়— চিন্তা করিতে করিতে জনকের মৃত্তিক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; রক্ত কোপানল অবসর পাইয়া আজ অগ্নিমুখে বাহির হইতে চাহে; “অভিশপ্ত বনবাধা” অভিশাপের আকারে আত্মশ্রীকণি করিতে চাহে। কৌশল্যা

দেখিলেন, সর্বনাশ, এখনই বুঝি অধোধ্য দৃষ্টি হইয়া যায়, রাজপরিবারবর্গ অভিযুক্ত হইয়া উৎসন্ন প্রাপ্ত হয়, রত্নকূল ছাড়খারে যায়। রাজসভা আতর্জন করিয়া উঠিলেন “ভগবতি, জুড় রাজবিকে এসন্ন করুন।

অকস্মাৎ দেখিলেন—শম-প্রধান ভগোবনে আজি দাহাশ্রক, গৃহ ভেদ অগ্নিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে; তপ্ততাবর্জিত ক্ষত্রিয়ভেদ অগ্নি ভয়ানকরূপে দেখা দিয়াছে। তখন অকস্মাৎ, বৎস রামভদ্রের করণচূর্বল দেহজ্বলি জুড় ‘রাজবির’ সম্মুখে ধরিলেন; প্রতিপাল্য হতভাগ্য পৌরজনবর্গের প্রকৃত অবস্থা মনে করাইয়া দিলেন। তখনই জনকের সেই দাক্ষ কোপানল শান্ত হইয়া আসিল; পুত্রহানীর রামভদ্রের উপর একটি করণ সমবেদনা আগিয়া উঠিল। “ভূরিষ্ঠবিজ-বালবুদ্ধবিকল-শ্রেণচ পোয়ে জনঃ” বলিয়া রোষপ্রকাশ নিফলবোধে রাজবি শান্ত হইলেন।

অশ্রমে বজ্রের অশ্ব আসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণবালকগণ নৃতন জীবটিকে দেখাইবার জন্য লবকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। লব শাস্ত্রজ্ঞানে বুঝিল, অশ্রমে বজ্রেরই অশ্ব।

“বিশ্ববিজয়িণ্য উজ্জ্বলঃ সর্বক্ষত্র-পরিভাবী মহান্ উৎকর্ষনির্ভবঃ” লবের ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্র ক্ষত্রিয়-ভেদঃ ধীরে ধীরে কুটিয়া উঠিতে লাগিল। তারপর যখন তনিল

অরবণঃ পতাকেরমধরা বীরধোষণা।

সপ্তলৌকিকবীরত্ব দশকর্ষকুলবিধঃ।

এই ক্রোধোদীপক অরবণ, এই রাজনিক বাণী লবের ক্ষত্রিয় ভেদে প্রভুত অপ্রভুত করিল। “কি, পৃথিবী কি নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছে”—বলিয়া লব অরবণের মধ্যে একটি বাধা অপ্রভুত করিলেন—

“ন ভেদভেদস্বী প্রহতমপরেণ্য প্রসহতে”

## উত্তরচরিত

“মহারাজ রামচন্দ্রের নিকট আবার কত্রির কে?” রাজপুরুষের  
এই দর্পিত বাণী শুনিয়া লব তখন রামচন্দ্রের জয়বৈজয়ন্তী, সেই  
উৎকর্ষ ও নিরুৎসাহরূপ অর্থটি গ্রহণ করিলেন। তখন লবের কথামত  
ব্রাহ্মণবালকেরা অথকে ভগ্নোবনের মধ্যে তাড়াইয়া লইয়া গেল।  
“সক্রোধদর্শ” রাজপুরুষবর্গের দীপ্যমান অস্ত্রশ্রেণী বন্ধক করিয়া জলিয়া  
উঠিল। লবেরও উৎকট-কোটিক কোলও হইতে ঘন-ধ্বংস ঘোর উদ্ভিত  
হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার উপক্রম হইল।

---

## পঞ্চমাক্ষ ।

পঞ্চমাক্ষের বহনিকা উঠিল। চক্রেতে রথে চড়িয়া রণসাজে সাজিয়া আসিল। সঙ্গে মাত্র সারথি স্তম্ভ। চক্রেতে বসিত নেড়ে চাহিয়া দেখিল—তাহার সৈন্তগণের উপর অনবরত শরতুষার বর্ষণ হইতেছে। কোপে জ্বলন্ত রক্তিমুখ—ও কে বীর-শিশু, শরাসনে টকার দিতেছে। বীরের মন বিস্তরে আনন্দে সজ্জমে ভরিয়া গেল। ও যে মুনিবালক, আশ্চর্য্য! এ কি কৌতুক, আশ্চর্য্য স্তম্ভ!

দশরথের সারথি স্তম্ভ চক্রেতে সন্মানের পাত্র, তাই এই “আর্য্য” সন্মান। লবের পানে দৃষ্টি পড়িবারাত্র স্তম্ভ বসিত হইল। মনে হইল বেন, শিশুরূপে বহুদান সস্ত্রুখে দণ্ডারমান। বিশ্বাসিতের বজ্রে ব্রাহ্মণ বধন ব্রাহ্মসংগের উপর শরবৃষ্টি করিয়াছিলেন—সেই ছবিটা স্তম্ভের মনে পড়িল। সেই নীলোৎপল ভ্রামবর্ণ, সেই অজ্ঞাতাব-গভীর ভাব, সেই মনোরম কাকপক্ষুড়া মানস-নেড়ে কুটিরা উঠিল, রামের পুত্র, লক্ষণের পুত্র—উভয়েই রাজর্ষি জনকের দৌহিত্র। পরস্পরের আকারগত সাদৃশ্য বিশেষরূপেই বিদ্যমান।

একদিকে লব একাকী। অস্তাদিকে শত শত সৈনিক দণ্ডারমান। একের বিরুদ্ধে এত লোকের অভ্যুত্থান!

চক্রেতে বড় লজ্জা হইল। বীর বীরত্বের মূল্য বুঝে। বুঝ যে কল্পধর্মের অন্যায়ত্ব, প্রকৃত বোকার বুঝ যে মাহুদ মারার বজ্র মাত্র নহে—তাহা লব-চক্রেতে বুঝেই বেশ বোঝা যায়। বালকের বুঝে আজ বীর সৈনিকগণের পরাজয়, ভৌতিক লজ্জা তাহাদের দুপাকর প্রজ্ঞা-

## উত্তরচরিত

বর্তন ! বিনয়ের উপর বিনয়, লজ্জার উপর লজ্জা, সজ্জের উপর সজ্জ !  
চন্দ্রকেতুর রথও বৃহর্ক-মধ্যে লবের সম্মুখে উপস্থিত ।

চন্দ্রকেতু তখন লবকে ডাকিয়া বলিল—

তো ভো লব মহাবাহো কিমেতিত্ত্বং সৈনিকৈঃ ।

এবোহমেহি মামেব তেজন্তেজসি শাস্যতু ॥

“ওহে লব, কুত্র সৈনিকগণের সহিত আর তোমার বৃদ্ধে কাজ কি ?  
এই আমি আছি, আমার নিকট এস, তেজ তেজেতেই শাস্ত হউক ।”  
এই বিনয়মস্তণ তেজ, এই শাস্ত-মধুর বীর ভাব চন্দ্রকেতুর চরিত্রটি  
মনোরম করিয়া তুলিয়াছে । প্রকৃত ক্ষত্রিয়বীরের বীরগর্ভ আজ বাণীরূপে  
বহিঃপ্রকাশ লাভ হইয়াছে । চন্দ্রকেতুর সদরোহিত আহ্বানে লব  
সৈনিকগণকে ত্যাগ করিয়া তাহারই লক্ষ্যে ধাবমান হইল । বেন গর্জিত  
সিংহশিঙ মেঘনিদাদ-প্রবণে হস্তির দল ত্যাগ করিয়া মেঘের দিকে  
ফিরিয়া বাড়াইল । পদক্ষেপ যেমন দ্রুত, তেমনই উচ্চত ।

“সাধু, রাজপুত্র, সাধু, ইক্ষাকুবংশের যোগ্য ভূমি, অপেক্ষা কর—এই  
আমি এই বাইতেছি” বলিয়া লব যেমন কিরিবে, অমনই পশ্চাতে  
ভীষণ কোলাহল । ইক্ষাকুবংশের গৌরব রক্ষা বে করিতে জানে, সে  
সাধুবাদেব যোগ্য । পশ্চাতে কোলাহল শুনিয়া—“ধিক্ সুখ, তোমাদের  
এই ঘন-ভুমূল রণকোলাহল এখনই শাস্ত করিতেছি” বলিয়া যেমন লব  
সৈনিকগণের দিকে কিরিতে বাইবে, অমনই শুনিল যে, চন্দ্রকেতু বলিতেছে—

অত্যন্তুতাবসি গুণাতিশয়াং প্রিয়ো যে

তন্মাং সখা স্বমসি স্বম্বন তৎ তরৈব ।

তৎ কিং নিজে পরিক্রমে কখনং কয়োমি

নবেব দর্শনিকর্ষত্ত্বং চন্দ্রকেতুঃ ॥

কুমার লব, এই আতি-সমুদ্র গুণের আতিশয়ে ভূমি আর বইয়াছে ।

একশে তুমি যেমন আমার সখা, আমি তেমনি তোমার সখা ; আমার পরিজনও তোমারই পরিজন, তবে নিজ পরিজন কয় করিয়া কল কি ? তোমার বীরদর্পের কটিপাখর আমি রহিয়াছি, বীরত্বের প্রকৃত পরীক্ষা আমাতেই হউক ।

অসম যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে । মোতী দুর্বোধন হৈপারনহুদে উকভদের দিন ভীমকেই বেচ্ছার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বরণ করিয়া লয় । পানী জরাসন্ধও কুবাকর্জুন অপেক্ষা ভীমকেই বলবান দেখিয়া তাহার সহিত হস্তযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় । চন্দ্রকেতু উনার মেহময় কিন্তু সে ক্ষত্রিয়বীর ; কত্রোচিত ভেজ, বীরত্ব, অভিমান তাহার অতীব প্রবল । “নন্দ্রের দর্পনিকবস্ত্রব চন্দ্রকেতুঃ” কথাটা প্রসঙ্গ অখচ কর্কশ ; লবের নিকট বড় মধুর, বড় তীক্ষ্ণ লাগিল । বড় হর্ষে, বড় সহস্রমে লব যেমন চন্দ্রকেতুর দিকে গতি কিরাইবে, অমনই আবার সৈন্তদলের ধন কলকলধ্বনি শোনা গেল ।

চন্দ্রকেতু প্রকৃতই মহাহুতব বীর । একের বিরুদ্ধে অনেকের আক্রমণ তাহার প্রাণে সহিবে কেন ? তখন সেনানীদের “মিক্ মূর্খ” বলিয়া চন্দ্রকেতুও গালি দিল । লব চন্দ্রকেতুরই ত ভাই ; সে সৈন্ত-দিগকে আক্রমণ হইতে বিরত করার আদেশকে তাহার উপর করুণা ও সহানুভূতির নিদর্শন বলিয়া ব্যবিল ; ভাই লবের মনে একটা বাখার অহুতব হইল । যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট এ দয়া, এ সহানুভূতি সে চাহে না । তৎক্ষণাৎ লব ব্যানবোগে উদ্ভূত জুস্তকাত্তের প্রয়োগ দ্বারা সৈন্তদিগকে একবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল । সে সৈন্ত-কোলাহল যুদ্ধের মধ্যেই ধামিরা গেল । যুদ্ধক্ষেত্রে তখন চিত্তাশীতবৎ নিঃশব্দ । এ এক অহুতপূর্ব ব্যাপার !

এখনাকে চিত্তবর্পন-প্রস্তাবে প্রানচত্র লীলাকে বর দান করেন ;

## উত্তর চরিত্র

আমার এই জন্তকাঙ্ক্ষা-বিভা তোমার গর্ভস্থ সন্তানে সংক্রমিত হউক।  
 অল্পশক্তির মত জন্তকাঙ্ক্ষা-বিভা তাই জন্মিবামাত্রই লবের অধিগত হইল।  
 জন্তকাঙ্ক্ষা-বিভা মহাবি বিদ্যারিজের দান, রাবের আশ্রয়ত্যাগের পুরস্কার।  
 এ অল্প বেন অন্ধকার ও বিদ্যাৎপূজের সন্নিহিত। এ একপ্রকার বৈজ্ঞানিক  
 ব্যাধির। এ অল্পের তমোমর তেজে চক্ষু প্রথমে মুগ্ধিত হইয়া আইলে,  
 চাহিলে চক্ষু বলসিয়া যায়, পরক্ষণেই দারুণ বাধা অনুভব করে।  
 তার পর নিম্পক্ষ অবস্থা, চিত্তলিখিত দশাপ্রাপ্তি।

লব ও চক্ষুকেতু পরস্পরে সম্মুখীন হইল। তুল্য রূপ, সমান বয়স,  
 মনোবৃত্তিও এক জাতীয়। পিতৃ-সম্বন্ধে এবং মাতৃসম্বন্ধে হৃদয়ের বেহে  
 একই রক্ত বহমান। লব চক্ষুকেতু পরস্পর পরস্পরের নিকট বড়ই প্রিয়-  
 দর্শন বলিয়া বোধ হইল। মেহ ও অহুরাগের সহিত উভয়ে উভয়কে  
 দেখিল। এ বেন অহেতুক মিলন, এ বেন “জন্মান্তর-নিবিড়বন্ধ পরিচয়,”  
 এ বেন অজ্ঞাত রক্তসম্বন্ধের প্রভাব। ইহা জীবগত ধর্ম যে, কাহাকে  
 দেখিবামাত্র কাহারও হৃদয়ে অহুরাগের সঞ্চার হয়। কবি এইরূপ  
 অহুরাগের নাম দিয়াছেন তারারৈজক বা চক্ষুরাগ। তারার তারার মিল,  
 রাশিচক্রে মিল, গ্রহনক্রে মিল যে, ভালবাসা ও প্রীতিসংসারের হেতু—  
 ইহা আমাদের জ্যোতিবিশ্বাসের কথা।

“অহেতুঃ পক্ষপাতো বস্তুত নাস্তি প্রতিজ্ঞিয়া।

ন হি মেহাশ্বকতন্তরন্তর-মাণি লীল্যন্তি ॥

কলিণ বিনা যে অহুরাগের সঞ্চার হয়, তাহার কখন উদ্ভেদ দেখা যায়  
 না। সেই মেহময় স্তম্ভী হৃদয়কে এক সঙ্গে ছুড়িয়া দেয়।

চক্ষুকেতু ও লবের হৃদয়ে দুঃখপং একই ভাবের উদয় দেখা গিল।  
 উভয়েই ভাবিল—আসিলনাশায় যে অল্প পুঙ্ক ছুটিয়া উঠিলে, সে  
 চিকণ কদমীর আসে কি করিয়া অল্পক্ষেপ করিয়া যাইবে? উপায় কি?



স্বপ্নক্ষেত্রে আসিরা ও রূপবিশুণ হওয়া বার না। বীর হইয়া বীরস্বর্গ পালন না করাও সম্ভব হয় না। কি কষ্টের মেহইন বীরের আচার।

“বীরাণাং সময়ে হি দাক্ষণরসো মেহক্রমো বাধতে”

স্বধাক্ষত চন্দ্রকেতু লবকে পানচারী দেখিরা “ইহা কজিরধর্ম নহে”, বুঝিরা রথ হইতে অবতরণ করিল। লব পানচারী, নিজে স্বধাক্ষত—এ বৃদ্ধ ত স্তারবৃদ্ধ নহে। আর প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সমক্ষে দাঁড়াইলে নিজেরই সম্মান। কিন্তু চন্দ্রকেতু এই অবতরণকে বীরের পূজা বলিরা মনে করিল। রঘুবংশের সর্বাদাত্তিক হুম্মর চন্দ্রকেতুর এ সাহসের কাব্যটিকে বারণ করিতে পারিল না। যদিও চন্দ্রকেতু বালক, তাহার জীবনের শুভাশুভ হুম্মরের উপর নির্ভর, তথাপি হুম্মর কর্তব্যের নিকট মেহের বলি মিল। বস্ত্র হুম্মর, বস্ত্র চন্দ্রকেতু !

লবও বীর, নামের পুত্র। সে রক্তের গুণ কোথায় বাইবে ? তাই লব চন্দ্রকেতুকে রথ হইতে অবতরণ করিতে বারণই করিল। অথচ নিজে চন্দ্রকেতু-দত্ত অস্ত্র রথে আরোহণ করিরা যুদ্ধ করিতে চাহিল না। তিতরে প্রেক্ষণ গর্ক, তথাপি তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান বজায় রাখিরা বিনয়ের সহিত স্বধা-রোহণ-প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিল।

“কো বিচারঃ শ্রেণু উপকরণেবু কিম্ব অরণ্যসনো বরমনস্তত্তরখচর্চাঃ”

“অবশ্য স্বধারোহণে আমার কোন আপত্তি নাই। অরণ্যচারী আমি—স্বধারোহণে আমার অভ্যাস নাই।” দর্প সৌজন্তের কি বিচিত্র মিলন।

লব-চন্দ্রকেতুর ব্যাপারটি আগাগোড়া বিচিত্ররসের মিশ্রণে একপ্রকার উপভোগ্যই হইয়াছে। রক্তনের দৃষ্টি মেহপরোধারার অতিবিক্র, বাহু কিম্ব অঙ্গারীজ্ঞার বহুর্কণ আকর্ষণে সম্পূর্ণ প্রোক্ত। হুম্মর একবার ভাবিল, লব কি স্বধাক্ষতের পুত্র, সীতার গর্ভজাত ? লবর যে ইহাই ভাবিতে গছে। আখ্যায় পরকণে বিবেক আসিরা সে ভাবনা ছুঁর করিরা মিল। যে লভা

## উত্তরচরিত

বরাহন উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার আর পুষ্পগুলোর আশা কোথায় ? হৃদয় বাহা ভাবিতে চাহে, বৃত্তি অনেক সময়ে তার বিপক্ষে যায়। বসিও হুমত বলিল “লবের এই দর্শসৌন্দর্যের অল্পরূপ আচরণ দেখিলে রামভক্তের হৃদয় নিশ্চয়ই স্নেহে গলিয়া বাইত”। তথাপি বৃদ্ধ হুমতের হৃদয়ের এক কোণে “রামভক্তের হৃদয় স্নেহে গলিয়া বাওয়ার” অপর একটা কারণও ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

- লব তখন নিজ উনার হৃদয়ের এবং স্ববি-কুমারোচিত প্রশান্ত ভাবের দিক দিয়া বিচার করিয়া লজ্জিত হইল। সেই রামায়ণকথা-নারক হুমত রাক্ষসি রামচন্দ্র, তাহার অথ ধরিতাছি মনে করিয়া ব্যথিতও হইল; তাই হুমতকে কহিল “আর্য্য, আমরা সেই রাক্ষসির অঙ্গমেধবজ্ঞ পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে বজ্রোরাধ ধরি নাই। শৌর্য্য যোজ্ঞের আদর্শ অবোধ্যানাথের উপর আমরা কোনরূপ ঘেব ভাবও পোষণ করি না। তবে অশ্বরক্ষকের কজির-অবমাননাকরী উদ্ধত বাণী—

অরম্বঃ পতাকেরমথবা বীরবোধণা।

সপ্তলোকৈকবীরত দশকর্ষকুলধিবঃ ॥

আমাদের চিতে বিকার জন্মাইয়া গিয়াছে—তাই অথ ধরিতাছি। এই পুর্নিত বাণী কোন্ বীর সহ করিতে পারে ?”

লবের কথা শুনিয়া চন্দ্রকেতুও হাসিতে হাসিতে বলিল—সে হাসির মধ্যে ব্যর্থের হ্রস্ব প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। “জ্যেষ্ঠতাতের প্রভাবোৎকর্ষের প্রতি লবের এ অরম্ব মাত্র” রামচন্দ্রের প্রভাব বড়ই উৎকর্ষতা গভীর কহক না কেন, তাহাতে লবের হৃদয়ে অরম্ব আশা অন্যায়; বীরের নৌভাষ্য-পর্কে এ অসহিত্বতা, উনারতার পরিচায়ক নহে—তাই চন্দ্রকেতু দীর্ঘ, দীর্ঘ, অসহিত্ব এবং ব্যথাপ্রাপ্ত হইল।

“ন ভেদভেদজ্ঞানী প্রস্তুতমপরেবাং প্রস্তুতৈ” লবের উক্তি। ভেদজ্ঞানী

কখন অপরের তৈজ সহ্য করিতে পারে না—ইহা সহ্য প্রকৃতি। কাজেই লবের হৃদয়ে এ অসহিষ্ণুতা জন্মিলেও তাহা কিছুতে অস্তিত্ব হইত না। লব কিন্তু আপনার হৃদয়ের গভীর তলদেশ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া রামচন্দ্রের উপর যে তাহার কোন অমৰ্ষ আছে, তাহা বুঝিতে পারিল না। লবের ধারণা, অধরক্ষকের গর্ভিত বাণীই এই যুদ্ধের মূল কারণ। স্বতাবতঃ দাত্ত, স্তবন রামচন্দ্র ও গর্ভিত নন, জনসাধারণের উপর ত তাঁহার কোনদিন উদ্ভতাও প্রকাশ পায় নাই—তবে তাঁহার সৈনিকেরা এ উদ্ভত বাণী প্রচার করে কেন? এ ত রামচন্দ্রের প্রকৃতির যোগ্য নহে। যে বাণী সর্ববিধ বৈরভাবের পোষক, বাহা দেশের অলম্প্রীতরূপা, তাহা যে রাক্ষসী বাণী। রবিশপ এ রাক্ষসী বাণীর নিন্দাই করিয়া থাকেন। লব যদিও ক্ষত্রিয়-কুমার, তথাপি সে শাস্ত্রিময় তপোবনে বাস করিয়া, মহর্ষির নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া আৰ্য-সংস্কারপূত হইয়াছে, সে সকল ক্ষত্রিয়-পরিভাবিনী বাণীকে অন্ততকরী, অলম্প্রী ও সর্বনাশিনী রাক্ষসী বলিয়া কেন মনে না করিবে?

লব যখন দেখিল,—“এই অশ্ব জয়পতাকা” এই রাক্ষসী বাণীই যুদ্ধের কারণ—তখন তাহা অমৰ্ষ হউক বা নাই হউক—তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাই চন্দ্রকেতুর কথার খোঁচাটি অনেককণ ধরিয়াই লবের মর্মে বিধিরা রহিল। ‘তাই লব চন্দ্রকেতুর কথায় উত্তর দিল “যদি আমার রামচন্দ্রের প্রভাবোৎকর্ষের প্রতি অমৰ্ষই হইয়া থাকে, তাহাতে কোন দোষের কথা নাই। কাত্ত-বর্ষ ত আর ব্যক্তি-বিশেষেই আবদ্ধ নহে।” বাস্তবিকই বীর-সর্ব, কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে যে, অপর কাহারও তাহাতে অধিকার থাকিবে না।

সুহ্ম হির বীর, লবের প্রতি ঘেহ-বিশিষ্টও বটে। এদিকে সে প্রকৃতক, দশরথপুত্র অযোধ্যানাথ রামচন্দ্রের উপর তাহার অগাধ প্রীতি; লবের

এ নপিত বাণী তাহার প্রেরণ একটী আলার হুটি করিল। বালকের এই অনধিকার চর্চার, রামচন্দ্রের প্রতি সাক্ষ্যে ব্যবহারে, হুম্র বিরক্ত হইল। চন্দ্রোদরে সবুজ উজ্জ্বলিত হয়, আবার বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। হুম্রেরও তাহাই হইল। স্কুচিঙে লবের কথার তীক্ষ্ণ উত্তর না দিয়াও পারিল না—

“তুমি সে ইক্ষুকু-কুলাবক্সে রামচন্দ্রকে জান না, অতএব তাহার বিষয়ে এ অতিপ্রসঙ্গ হইতে বিরত হও। সৈনিকগণকে জয় করিয়া বীর্যবতা দেখাইয়াছ বলিয়া সেই জামদগ্ন্য-বিজ্ঞতার ষ্টমর তোমার কটাক করা সাজে না।” রামচন্দ্রের প্রতি অবজ্ঞাপূচক এ উক্তি লবের পক্ষে অতিপ্রসঙ্গ বলিয়াই হুম্র তিরস্কার করিল।

লব সাধারণভাবে বাল্য বলিল, তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে রামচন্দ্রের কোন রূপ অসম্মান করা হয় নাই। হুম্র কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবেই লবকে আঘাত না করিয়া পারিল না। লব বীর, ইক্ষুকু-রক্ত তাহার ধমনীতে বহমান, সে সহ করিবে কেন? কথার কথা বাড়িয়া বার, স্কুলিঙে হুংকার দিলে তাহা নপ্ করিয়া বলিয়া উঠে। লবও দীর্ঘ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উপহাসের সহিত হুম্রকে কহিল—

ব্রাহ্মণের বাক্যে বল, ক্ষত্রিয়ের বাহুতে বল—ইহার এসিকি আছে। অতএব শাস্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্মণ জামদগ্ন্যের বিজ্ঞতা বলিয়া রামচন্দ্রের আর প্রশংসা কি?”

চন্দ্রকেতুর আর সহ হইল না। জ্যেষ্ঠভাতের প্রতি দ্রুত বড় অবজ্ঞা-পূচক কথা সে কখন শোনে নাই। লক্ষণপুত্র এ তীব্র আঘাতে আহত-প্রায় হইয়া উঠিল। কথোপকথন আর চলে না। লবকে এ প্রকাত আক্রমণের উত্তর দেওয়া চন্দ্রকেতুর পক্ষে অসম্ভব। ক্ষুব্ধ ব্যক্তিগত রূপে হুম্র তাই হুম্রকেই বারণ করিল। অবশ্য পুরোক্তভাবে লবের আক্রমণ প্রতিবর্ত করাই হইল।

আৰ্য্য, আৰ্য্য,—কৃতমুত্তরোত্তর—

কোম্পোষ সন্ততি নহ পুৰুষাবতারঃ

শ্রাব্যো ন বহু ভগবান্ ভৃগুনন্দনোহপি ।

পৰ্য্যাপ্ত সপ্তভূবনাতরবক্ষিপানি

পুণ্যানি ভাতচরিতানি চ যো ন বেদ ॥

আৰ্য্য, আর কথা কাটাকাটির প্রয়োজন নাই। কে ইনি নতন পুৰুষাবতার হইরা আসিয়াছেন, বাহার নিকট ভগবান ভৃগুনন্দনও শ্রাব্য বিবেচিত হন না। সপ্ত ভুবনের অন্তর্যাতা শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যময় চরিতও তুম্হ প্রভীত হয়।

জীহত্যার বাহার বীরত্ব, বালিবধে বাহার কোশল, ভীহার বীরত্বকোশল কে না জানে ? লব যখন রামচন্দ্রের প্রতি এই ভীত বিজ্ঞপোক্তি করিল— তখন চন্দ্রকেতু লগ্নাহত বিষয়ের মত গর্জাইতে লাগিল “আঃ তাতাপবাদ-ভিন্নমৰ্য্যাদ অতি হি নাম প্রগল্ভলে” বলিয়া নিদারুণ ক্রোধে উন্নত হইরা উঠিল ; স্বভাবতঃ আরক্তিম চক্ষু দিয়া অগ্নিস্কুলিক বাহির হইতে লাগিল। লবের এ প্রগল্ভতা উত্তেজিত হৃদয়ের কল বলিয়া আমরা ধরিয়া লইরাছি। নচেৎ লবচরিত্রের মহত্ব একটু স্মরণ হইত।

তখন ছই মহাবীর সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য বিমর্দনকরা ভূমিতে অবতরণ করিল। তখন শিরদর্শন, কোমল প্রকৃতি লব ও চন্দ্রকেতুকে কল্পদর্শন এবং কঠোর বলিয়া বোধ হইল।

সংস্কৃত নাটকে নেপথ্যেই যুদ্ধ হওয়ার কথা। যুদ্ধ বল, হত্যা বল, এ সকল কল্পমধ্যে দেখান নিষিদ্ধ। বর্ণনা দ্বারা যুদ্ধের ছবিটি স্তব্ধে ফুটাইরা তোলাই কবির কলা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধব্যাপারটি বহু অঙ্কের বিকল্পকে বিভাবর-বিভাবরী সংবাসে বিবৃত হইবে।

## ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথমেই বিকৃতক। আকাশপথে বিজ্ঞান-বুগলের আবির্ভাব। লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিবার জন্য তাঁহার উজ্জল বিমানে চড়িয়া অন্তরীক্ষে উপস্থিত। একটিকে দেবতা-বৃন্দ গভীর-মাংসল দেব-হৃদয় ধনি দ্বারা সময়সাগর বর্জন্য অগ্রসর। অপরটিকে—দেবীগণ “মণিবুকুল মকর-জ্বলর” পুষ্পবর্ষণ দ্বারা মাজলা-বিধানার্থ সমুৎসুক।

লব-চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ বস্তুতই অদ্ভুত। এ যুদ্ধ-কৌশলের নিকট বিংশ-শতাব্দীর যুদ্ধকৌশলও হার মানে। চন্দ্রকেতু আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জান করিল, বিজ্ঞাচ্ছটার সহসা আকাশ পিকলবর্ণ হইয়া গেল—তাহার উজ্জ্বলতা শিখা দেবদেবীগণের বজ্রাকল রক্তচন্দনলিপ্ত করিয়া দিল। কি তাহার প্রদীপ্ত রশ্মি! বিশ্বকর্মার শাপবস্ত্রে আকৃত সহস্রকর বেন করজাল বিস্তার করিতেছে। আগ্নেয়াস্ত্রের বিক্ষুব্ধ অগ্নিফুলিকের জ্বালা-সজ্জার সহ করিতে না পারিয়া দেবদেবীগণ শব্দে রথ লইয়া উজ্জ্বল-জ্বরে পলাইয়া বাইতেছে।

বিজ্ঞান-দেবিল, তাহার প্রিয়ার কুন্তলকোমল অঙ্গ বলসিরা বায়, তখন অভিক্রম, নিবিড় বাত-আলিঙ্গনে সেই অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া স্থান ত্যাগ করিল। বিজ্ঞানী “মৌক্তিকসর-শীতল” মস্তক-মাংসল নাথদেহ-পর্শে হৃদয়কুলিতলোচনা হইয়া সে সজ্জাপ নিষেধমধ্যে কুলিয়া গেল।

এইবার শেষের কাণ্ডশাস্ত্র সজ্জান। “মহুর্কট-ভারম” বেকল আনিয়া সমস্ত নভবল মলী-কক করিয়া দিল। এমন অবিভল প্রবৃত্ত বীজিবায় বর্ষিতে লাগিল যে, আগ্নেয়াস্ত্র-জ্বালা যুদ্ধের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া যেন।

উঃ, সে কি বিরাট অঙ্ককার ! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বেন সেই অঙ্ককার-পুঞ্জের মধ্যে ডুবিয়া আছে । কলকণ্ঠের ব্যারিত বিশাল মুখগহ্বরে প্রাণিগণ বেন নিশ্চেষ্টমান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ।

সহসা রণস্থল আলোক মর হইয়া উঠিল । বিদ্যাতালোকে দেখা গেল, রামানন্দ-কথা নায়ক রামচন্দ্র বিমান লইয়া এই লব-চন্দ্রকেতুর মধ্যস্থলে উপস্থিত । দুই মহাবীরের উত্তত-অস্ত্র নিম্নেবে খামিয়া গেল । পক্ষবলী হইতে কিরিবার পথে শিশুঘরের দুই শুনিয়া রামচন্দ্র শান্তিদেবতার মত বিমান হইতে অবতরণ করিলেন ।

“দিনকর-কুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো

সমস্তলমেহি দৃঢ় পরিবর্তন”

“স্বর্গাকুলচন্দ্র চন্দ্রকেতো, এস, সমস্ত আমাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন কর ! তোমার তুহিনশীতল অঙ্গস্পর্শে আমার হৃদয়ের তাপ শান্ত হইয়া বাউক । এই বলিয়া রামচন্দ্র পুঞ্জোপম চন্দ্রকেতুকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন । তারপরই লবের দিকে তাঁর চক্ষু পড়িল । বৎস চন্দ্রকেতুর বস্ত্র, এই ঝালকটীর গভীরাকৃতি তাহাকে মুগ্ধ করিল । মনে হইল, লোকপালনের জন্য যত্নবর্ধে বেন শরীরী হইয়া উপস্থিত ; বেদরূপ রত্নাঙ্গার রক্ষার জন্য কালবর্ধ বেন মূর্তি ধরিয়া দণ্ডায়মান । এ বে বীৰ্য্য শৌর্যের সমবায়, দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের লুমটি ! জগতের পুণ্যানিধাণ-রাশি বেন সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে ।

লবেরও কি আশ্চর্য্য পরিবর্তন ! সে বিরোধিতায়, সে উদ্ধত্যা দূরে সিঁচা তাহার হৃদয়ে মুহূর্তের মধ্যে এক “প্রীতিবন” রসের আবির্ভাব দেখা গেল, বীরের পক্ষোন্নত শির কি এক বাহুযন্ত্রে সহসা বিনয়াক্ত হইল—আশ্রয়, কোমর এক ভক্তির এক প্রাণ অঙ্গলখন—প্রকৃতি বর্ষের মূর্তিনন্দ এসব—এই কি মহাপুরুষ রামচন্দ্র ? কি পুণ্যাক্তব-দর্শন !

চন্দ্রের উন্নয়ন হইলে চন্দ্রকান্তবণি ত্রবীভূত হয়, লবের মুখচন্দ্রদর্শনে রায়চন্দ্রেরও মন বিগলিত হইল। রায় আর থাকিতে পারিলেন না ; লবকে সম্বোধন করিলেন। সে “পদ্মদল-গীন মন্থনমুকুয়ার” সে “চন্দ্রচন্দ্রনির্যাস” অভিশপ্ত রায়কে এক অজ্ঞের আনন্দ অহুত করাইল। অজ্ঞাত পুত্রসেই যে এই “নির্বৃত্তি-ধন” রসের সঞ্চায়ক, এই অজ্ঞের আনন্দের জনক—রায় ইহা কিরূপে বুঝিবেন ? তিনি ইহাকে নিমিত্ত-নিরপেক্ষ অহেতুক বেহ-প্রযুক্তির খেলা বলিয়া ধরিয়া গইলেন।

রায়চন্দ্রের এই অকারণ মেহ দেখিয়া লব নিজের আচরণের ভ্রম বড়ই অহুত হইল। “মুগ্ধস্থিমানীং লবন্ত বালিশতাং তাতপাদাঃ”—“লবের এই অবিমুগ্ধকারিতা করা করুন” বলিয়া মার্জনা চাহিল। রায়চন্দ্র গুণগ্রাহী—তিনি লবের এই কার্যটিকে কজিরের অলঙ্কার বলিয়া আরও গৌরব দানই করিলেন, তেজস্বী অপরের তেজ সহ করে না, ইহা তাহার প্রকৃতি-সিদ্ধ ধর্ম। হৃদ্যদেব অশ্রান্ত তাপ দিলে হৃদ্যকান্তবণি তেজঃকরণ করিবেই তা।\*

অকস্মাৎ লবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুশের গুরুগম্ভীর স্বর নেপথ্য হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বর্ষ হইতে এত্যাগমনের পথেই কুশ রাজসৈন্তের সহিত লবের বৃদ্ধ-ব্যাপার শুনিয়া আসিয়াছিল। সে আজ পৃথিবী হইতে সজাই শত্রু ছালায়া দিবে, কজির জাতির শত্রুগণ চিরদিনের মত নির্বাপন করিবে, এমনই তার হৃদ সঙ্গ। কুশের সেই বেদগম্ভীর ধ্বনি কোথায়

\* অশ্বত্থপ গোক কালিদাসের “অভিজ্ঞানশকুন্তল” নাটকের দ্বিতীয়রাক্ষে বলা—“পার্শ্বমুকুয়া অপি হৃদ্যকান্তবন্তভেদোহুতিভবাবহতি” এমন যে হৃদ্যপর্ণ হৃদ্যকান্তবণি, অস্ত-তেজের আক্রমণ পাইলে সেও দাহ জ্বাইয়া থাকে। তারবিভেদ আছে—কিমলেক-মাল্য পরোধরানি জনতাঃ প্রার্বকতে পর্য্যবিশঃ। প্রকৃতিঃ খলু স্য বহীরাঃ সহতে স্যাজ্জ সনুজতি বরা।। কার্যদি ২য় সর্গ।



উত্তেজনা আনিয়া দিবে, না—রামকে আরও পুনর্জিত করিল। অলঙ্কে পুত্রস্নেহও যে কার্য্য করিতেছিল না, তাহাও বলা যায় না। পশুতলার তনয় ভরভের দেহস্পর্শ হৃদয়ের উপরও একটি অজ্ঞাত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। লব ও কুশ হুইজনেই মহাবীর। অথচ উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কিঞ্চিৎ পার্থক্যও বিদ্যমান। কুশের ভুলনার লব অপেক্ষাকৃত কোমলপ্রকৃতি, কুশ অধিকতর ভেজস্বী। বিশেষতঃ কনিষ্ঠভ্রাতা লবের সহিত রাজসৈন্তের সংগ্রাম উনিয়া কুশ বিশেষরূপ উত্তেজিত হইয়াই আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিল; তাই তাহাকে অত উদ্ধত, অত গর্জিত, অত বুদ্ধিশ্রম দেখাইয়াছিল। বস্তুগত্যা কুশ ঐক্লম নহে।

কুশ আসিয়া রামের সম্মুখে দাঁড়াইল। তার দৃষ্টি “তুলীকৃতজগৎজয় সঙ্গারামা” ত্রিজগতের বলপ্রকর্ষকে যেন তুচ্ছ করিতেছে। তাহার গতি এমনতই ধীরোচ্ছতা, যেন পদতরে ধরিজীকে নামাইয়া দিয়া বাইতেছে। বয়সে কুমার অথচ পর্কভের মত দৃঢ়। একি মুক্তিমান বীররস—না, সাক্ষাৎ মর্প আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল।

লবের অহুরোধে আর রামচন্দ্রের অহুতাব-দর্শনে কুশ তখন রামায়ণ-কথানায়ক অধোধ্যানাথকে অতিবাদন করিল। রামচন্দ্রও তখন সেই “সজলজলধরমিত্র” দেহখানি আলিঙ্গন করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার প্রান্ধাধিকারী এবং রাজ্যাধিকারী বলিয়া সাধারণতঃ পিতার প্রিয়তম হইয়া থাকে। আর পিতার সাদৃশ্যও জ্যেষ্ঠেই অধিকতর লক্ষিত হয়, তাই কুশকে আলিঙ্গন করিয়া রামের বিশেষভাবে মনে হইল—  
“কিনমপত্যময় দারকঃ—” ( পুত্রঃ )

অদ্বাদদ্যং ক্রতইব নিজে দেহজঃ দেহসারঃ

প্রোদ্ধতুর স্থিত ইব বহিঃশেতনাব্যাকুরেব ।

## উত্তর চরিত

সাহসিক-কুড়িভদ্র-প্রবেশে দৃষ্ট

গাজাঘোষে বহুভদ্রস্রোতলা নিকটবর্ষ

এ কি আমার সন্তান ! সর্ব অধর হইতে করিত আমার দেহভাত  
দেহসার কি সন্তানরূপে পরিণত হইরাছে ? শরীরমধ্য হইতে নিঃসৃত  
আমার চেতনাখাত কি মূর্তিমান হইয়া আসিয়াছে । “সাহসিক-কুড়িভদ্র”  
কি প্রবীকৃত হইয়া পুরুরূপে লম্বুখে দাঁড়াইরাছে । তাই আলিঙ্গনে আমার  
গাজা সহসা অনুভবস্রোতে নিকিত হইয়া উঠিতেছে ।

“অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে”—হৃদয়েরও মনে হইয়াছিল, আমারই এই  
মুখ, না জানি পূর্বদেহ স্পর্শে জন্মদাতা পিতার কি মুখ হয় ?

রামচন্দ্র তখন কুশ ও লবের মধ্যে রঘুকুলকুমারের ছায়া প্রত্যক্ষ  
করিলেন । সেই “কপোতকর্ণ-শ্রাম” দেহ, সেই সৌষ্ঠবপূর্ণ স্তন্য গঠন,  
সেই “প্রসন্নসিহস্তিমিত” দৃষ্টি, সেই “মৃদলমাসল” ধ্বনি—রঘুকুমার  
না হইয়া যায় না । আরও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে গিয়া দেখিলেন,—  
“একি, জনকতনয়ার সেই সৌন্দর্য্য পরিমুচুতভাবে বর্তমান । প্রিয়ার  
আমার অভিনব শতদলের বহু মুখশ্রীটি পর্য্যন্তও বেন সম্পূর্ণ বিস্তারিত ।  
সেই-মতই মনোহারিণী মুকাম্বুজবি, সেই-মতই আরক্তিম অবরোষ্টি  
ভল্লী” আর সেই-মতই শোভমান কর্ণদুগল । নেত্রছটী যদিও বীরোচিত,  
“রক্তনীল” তথাপি সেই মতই সৌভাগ্য-গুণবৃত্ত, আর সেই-মতই  
ললনানন্দকর ।”

রামের চিত্তে তখন আশার নূতন তরঙ্গ খেলিতে দেখা গেল,  
“ইহাদের কৃতকার্য্য স্বতঃপ্রকাশ ও জন্মসিদ্ধ দেখিতেছি, ইহা আমার  
আখ্যাস । আর নির্ভয়ে, বিপ্রকা ও সহজলজ্জাকঙ্করনা, সীতার  
গর্ভগ্রাহিণী ও বিধা অকৃতক্য করিয়াছিলাম । পূর্বস্মৃতি জাতিয়া উঠিল, সীতার  
সেই “নিবৃত্ত নির্ভয়ান” তখন ও তাঁহার মনে পড়িল । নেত্র

হইতে অপ্রখ্যাতা গলিত হইয়া তাঁর কপোলাঙ্গলী করিয়া প্রাবিত করিয়া দিল।

কুশলর আপনাদিগকে বাস্তবিক নিয়ন্ত্রণেই স্থির করে ; তাহারা যে বাস্তবিকের পুত্র, সীতার সন্তান, তাহা জানেন না। তবে বাস্তবিকের সন্তান রামায়ণে রামসীতার অনেক কথাই তাহারা পাঠ করিয়াছে। পুত্রের মুখে, বিশেষতঃ শিশুজনের মুখে, শিতা মাতা বা সাক্ষাৎকার অর্থাৎ রামসীতার প্রণয়ের কথা বড়ই মধুর লাগে। কুশলকে বুঝাইতেছে—“সীতার বিহনে রামের কত দুঃখ, শ্রিয়ান্ধে সমগ্র জগৎ তাঁহার কাছে অরণ্য, আর তাঁহাদের কি ভালবাসা, কিবা নিরবধি বিরহ।” “উঃ কি নিরবধি বিরহ”—তৃতীয়াঙ্কে একবার রাম মিছেই বলিয়াছিলেন ; তথাপি রাম এখানে কাঁপিয়া উঠিলেন। প্রকৃত পক্ষে “নিরবধি” বিরহকে “সাবধি” করার (রাম সীতার মিলন দ্বারা) করি সার্থকপণের সহায়ত্বের পাত্র এবং প্রাণসার ভাজনই হইয়াছেন।

কুশল রামকে রামায়ণের স্নোক শুনাইতেছেন :—কি মধুর, কি উপভোগ্য। বলাকিনী-ভীরে চিত্তকুট-বনবিহারে সীতাদেবীর উদ্দেশ্যে রত্নপতির উক্তি :—

সদাশিব বিস্তৃতঃ শিলাপট্টোহয়মগ্রতঃ ।

বস্ত্রাবভিঃ পুটৈঃ প্রসুট ইব কেশরঃ ॥

দেবি, এই শিলাপট্টের আসনটি তোমার বলিবার জন্মই বিস্তৃত আছে। দেখ, বকুলতরু পুষ্প-বৃষ্টি করিয়া ইহার চারিধার কেমন সুরভিত করিয়া রাখিয়াছে।

স্বাক্ষর চন্দ্র উপর তখন তাসিয়া উঠিল—“সীতার সেই “বাহু-সঙ্গীত” কলকামলী, কেই বক্তিসমোজ্জ্বল কপোলে স্থানি, সেই “সিরাহরপ্রসঙ্গ” মুখশ্রী। রাম ভক্তরতার জিহ্বাশিঙবৎ বহিরা রহিলেন।

## উত্তর চরিত

এদিকে বশিষ্ঠারুহতী, বায়ীকি, জনক ও মশরখমহিবীরা বালকদের বৃদ্ধ সংঘটন শুনিয়া ক্রতপদে যুদ্ধভূমি অভিমুখে আসিয়া পড়িলেন। বহুদিনের পর রামের সহিত সাক্ষাৎ ; কোন্ মুখে আর রাম তাঁহাদের নিকট মুখ দেখাইবেন ? ইহার অপেক্ষা রামের হৃদয় বেশতধা বিদীর্ণ, হইয়া গেলেও ভাল ছিল। দূর হইতে জনক কোশল্যাদিরাও “অল্পভব-মাত্রাবশেষ” ও সীতাপোকে শীর্ণকায় রান্নাকে দেখিবামাত্র মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তারপর দুঃখের মধ্যে, মর্ষবেদনার মধ্যে, সাধনার মধ্যে তাঁহাদের মিলন সংঘটিত হইল। সে মিলন ভাবার প্রকাশের নহে, তাহা রক্তমঞ্জে অভিনয়েরই যোগ্য। বাটলও তাই। আদি এবং বাৎসল্য রস বেন হাত ধরাধরি করিয়া পাশাপাশি দণ্ডায়মান। ছুটি ক্ষুদ্র নদী একই সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া ধীরে ধীরে প্রবহমান। আদি এবং বাৎসল্য ছুইটা রসই রামচন্দ্রে আসিয়া প্রকৃত পরিণতি লাভ করিয়াছে। ছুইটা নদী একই সাগরে আসিয়া কৃতার্থ হইয়া উঠিয়াছে।



## সপ্তম অঙ্ক ।

নাটকের মধ্যে নাটক । ইহা এক অপূর্ণ কৌশলময়ী রচনা ।  
বাণীক-সাম্রাজ্যের কিরকংশ লইয়াই গর্ভনাটক বিস্তারিত । ভাগীরথী-  
তীরে এই নাট্যভূমিরই স্থল । রাম, লক্ষ্মণ, লব, কুশ, চন্দ্রকেতু  
এবং জনক কোশল্যাদি সকলেই এই নাটক শুনিবার আশায় উপবিষ্ট ।  
বর্ষের গন্ধর্ব ও অশ্বরারী পাণ্ড পান্ডীর ভূমিকা লইয়াছে । সে দৃষ্ট  
দেখিবার জন্য, সে অভিনয় শুনিবার আশায় দেবীরা সকলেই তথার  
উপস্থিত হইয়াছেন ।

বনিকা উঠিল । নেপথ্য হইতে ভাগীরথী-তীরে বিসর্জিতা  
সীতার করুণ বিলাপ-ধ্বনি শ্রুত হইল । বায়ুতরঙ্গে তাসিতে তাসিতে  
ভাগীরথী-পার-শ্রুত সঙ্গীতের মত সে রব কর্ণে আসিয়া পৌছিল ।

“হা আর্ধ্যপুত্র, হা কুমার লক্ষ্মণ, গভীর বনে আসন্ন-প্রসব বেদনা  
আমি একাকিনী ; পাপানর খাপছেরা আমাকে অভিলাষ করিতেছে ।  
অশরণা আমি কি করিব ? ভাগীরথীর কোলে আপনাকে এখন  
নিবেদন করিয়া আমি শান্তিলাভ করি ।”

হৃদয়হার জানাইল, প্রাপ্ত-প্রসব-বেদনা সীতা আপনাকে সঙ্গাগর্ভে  
নিক্ষেপ করিয়াছে । অভিনয়ের দর্শনে রামচন্দ্র তখন এমনই তন্দ্রা—  
এমনই আত্মহারা বে, অভিনয়কে বাস্তব মনে করিলেন । উক্তয় নাটক  
অভিনয়-দর্শনে প্রকৃত রসজ্ঞ মহানর প্রোতার এ ভ্রম ঘটাইয়া থাকে ।  
দর্শনশাস্ত্রে বলে, গাঢ়স্থিতি নিরন্তর ভাবনা-প্রকর্ষে প্রত্যেক-দর্শনাকারে  
কুটরা থাকে । উজ্জ্বল রাম বলিয়া উঠিলেন—

## উত্তর চলিত

“দেবি, কণেক অপেকা কর; লক্ষণ, লক্ষণ, তুমি দেখ!” রাবের হস্ত তখন অবশ, ইন্ড্রিয় স্বর্ণমান, চিত্ত বিমূঢ়। তাই তিনি সীতাকে রক্ষা করিবার জন্য লক্ষণকে অস্বরোধ করিলেন। লক্ষণ তখন অশ্রু-ভার সজ্জিত করিয়া রামচন্দ্রকে ধরিয়া কহিল, “আর্য্য, নাটকবিদ্য” — এবে, নাটক! প্রথমাঙ্কে চিত্রদর্শন-প্রস্তাবে স্বর্ণনখার চিত্র দেখিয়া সীতারও স্বর্ণপথা-প্রতীতিই জন্মিয়াছিল। তখন রামচন্দ্রই সীতাকে বুঝাইয়াছিলেন, “অগ্নি বিরহ-ভীতে, ‘চিত্রমেতৎ’, — এবে চিত্র।

তাহার পর পৃথিবী ও ভাগীরথীর সঙ্গে তর দিবা দীপে দীপে সীতাদেবী রঙ্গমঞ্চে আসিয়া উপস্থিত হইল। সীতার দুইটা বমল শিশু গদ্য-কোরকের মত পৃথিবী ও ভাগীরথীর কোলে শোভা পাইতেছিল। শোকে ও প্রসব-বেদনার সীতা তখন অর্ধ-মূচ্ছিতা। পৃথিবী ও ভাগীরথী তখন সীতাকে জানাইলেন যে, এই দুইটা বমলশিশু গঙ্গার জলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কোথায় মৃত্যু, আর কোথায় এমন সুন্দর দুইটা বৃন্দ শিশু। সীতা তখন প্রত্যগতর্জীবিতা ও সমাধতা হইল, আপনার বর্তমান অবস্থা স্বরণ করিয়া আনন্দে, শোকে ও বৃন্দপং ভাবান্তিতে “হা আর্য্য-পুত্র” বলিয়া মূচ্ছিতা হইয়া পড়িল। বড় সাধের, রত্নবংশের প্রতীকাকরূপ এই পুত্রদ্বটিকে আর্য্যপুত্রের ক্রোড়ে দিতে পারিল না—ইহাই সীতার বড় দুঃখ! সীতা যথেষ্ট মর্মেই এ দুঃখ অহুতব করিল।

সীতা জানিল, ইনি রত্নকুল-দেবতা গঙ্গা আর ইনি গর্ভধারিণী জননী ধরিত্রী। এতদিনের পর, এমনত দুঃখের সময়ে সীতা যাকে পাইল। উন্নতা কস্তা নানিকার মত যারের বকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হা! ডির সন্তানের ব্যথা আর কে বুঝিবে, পতিহীনা কস্তা-অবলম্বন আর কে হইবে? সীতা বেন অকূলে কুল পাইল। দুঃখের অঁঘারে আশ্রয়ের আশ্রয়করম্মি দেখিতে পাইল। কস্তার মূখে “আর্য্যপুত্র”

উচ্চারণ শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ পূর্ববীরও বৈধব্যচ্যুতি ঘটিল—“আঃ কে তোরা আর্ধ্যপুত্র” এইরূপে কহা ভিরক্ততা হইল। যে বার্মী দ্বীপ প্রান্তি বাহীর কর্তব্য পালন করিল না, সে ‘আর্ধ্যপুত্র’ সম্বোধনের যোগ্যই নহে। নিরুদ্ভিমানিতা আদর্শ প্রণয়ের লক্ষণ। ইহাই সীতা-চরিত্রের অলঙ্কার। কস্তার এ ভেজলশুণ্ডতা মাতার কাছে অসহ প্রতীত হইল। জননী পক্ষে কস্তার অপমানজনক নির্কাসন কত বড় আঘাত দিয়া থাকে, তাহা বরিজীর ‘আঃ’ কে তোরা আর্ধ্যপুত্র এই কথাটিতেই বুঝা যায়। সীতা তখন মারের কাছে ভরে কাঁটা, লজ্জার জড়পড়।

ব্রহ্মকুল-সুবারঘরের বোগ্য কজ্জির-সংস্কার কে দিবে, ভাবিয়া সীতা তখন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পুত্র শুধু বাঁচিয়া থাকিলে চলিবে না; ব্রহ্মকুলের বালক ব্রহ্মকুলের উপযুক্ত হওয়া চাই। করুণাময়ী ভাস্করী সীতাকে সাহসনা দিলেন—বৎসে, সেজন্ত তোমার ভাবনা নাই। তত্ত-ত্যাগের পর তোমার পুত্রদের ভার আমি বাকীকরি করে অর্পণ করিব। সেই ঋষিই ইহাদের বখোচিত কজ্জির-সংস্কার করাইবেন। চিত্রবর্ণন-প্রকাবে রামচন্দ্র ব্রহ্মকুলের দেবতা ভাস্করীকে দেখীকে লক্ষ্য করিয়া কহেন—“দেবি ভাস্করী, সুসারামকস্তীব সীতারঃ শিবাহুধ্যান-পরা তব।” গঙ্গাদেবী সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া ব্রহ্মকুলের দেবতার কার্য করত রামের সন্ধান দ্রষ্টা করিলেন।

জননী বরিজী, কস্তাকে আলিঙ্গন করিয়া “পরিপাত্তুর্জল-কপোল-মুন্দর” সুখবাদি তুলিয়া কহিলেন,—“চল বৎসে, আমার লাভালগ্নহ পবিত্র করিবে।” সীতা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—

“যে‘মার’ বলে কেন আমার বিলীন করিয়া লও না মা ? আমি যে জীবনের এককক বিপদাশঙ্ক সহ করিতে পারিতেছি না।” বড় দুঃখে, বড় লজ্জার সীতা ইহা কহিল। সীতা ‘নির্মের’ জীবনের পরিবর্তন

## উত্তর চরিত্র

জীবলোকের পরিবর্তন বলিয়া বুঝিল। যনে হৃৎখ থাকিলেই জীবলোক হৃৎখময়, ইহাই স্বাভাবিক। সেই স্বাময়-জীবিতা, বনখাজার সন্নিবী সেই সীতা—আম নিম্নিত নির্বাসনযুগে দণ্ডিতা এই অভাগিনী সীতা।

পৃথিবী ও ভাগীরথীর স্বক্কে তর দিরা সীতা ধীরে ধীরে বহুতর হইতে নিজাক্তা হইল; গর্ভনাটকও শেষ হইল। সীতাবিসর্জন-সময়ে-রামচন্দ্র অসহায় সীতাকে দেখিবার তার লইবার অস্ত্র ধরিজীমেবীকে অস্বরোধ করেন,—“স্বরবেক্ষণ কানকীমিতি।”

বদিও আপনার কত সীতার উপর ধরিজী দেবীর মেহ স্বাভাবিক—সীতা বে রামের সামগ্রী, রাম তার না দিলে তিনি সীতার তার লইতে পারেন না ভক্তর রামের এই তারার্ণণ।

সীতা লোকান্তরে (পাতালই এখানে লোকান্তর) প্রস্থান করিল। এই তিরোভাব, এই অতর্কিত উপস্থিতির পর সীতার এই তিরোভাব রাম সহ করিতে পারিলেন না—মুর্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া পেলেন। লক্ষ্মণ তখন বাস্তবিককে লক্ষ্য করিয়া বেদনানিষ্ট হয়ে বলিল, “তববন্! রক্ষা করুন! এই কি আপনার নাটকের উদ্দেশ্য, এই কি প্রয়োজন?”

বহাপুরুষের অসুষ্ঠানের কল শুভ ব্যতীত অসুষ্ঠ হইয়া না। রামের জীবনই বদি সংশ্লিষ্ট হইল, তবে ইহা অপেক্ষা আর মন্য কল কি হইবে?

লক্ষ্মণ গঙ্গানগিল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; তাহার মন্য হইতে সীতাবিবী সত্য নতাই উখিত হইল। নাটক স্বাস্তব হইয়া দেখা দিল, ছাত্রা মুর্ছিত হইল। তখন পৃথিবী ও ভাগীরথী স্বনিষ্ঠ-পত্তী অকস্মটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—“অপত্যের বনমীরা দেবি, আমরা আজ পুণ্ড্রত সীতাকে তোমার নিকট অর্পণ করিলাম।” রাম মুর্ছিত, এ সময় অকস্মটিক-স্বক্কে কোন চিন্তা নাই। কি করিয়া রাম বাচিবেন, সেই ভাবনার স্বাক্ষর



## প্রাচীন চিত্র

দেবী সীতাকে অত্মরোধ করিলেন—“অবহিত হও বৎসে, এ লজ্জার সময় নয়। আমার বৎস রাহকে তুমি পাণ্ডিষ্পর্শে লজ্জাবিত কর।”

তৃতীরকে হারানুগা সীতা তমসার কথার সূচীত রাহকে স্পর্শ করিয়াছিল। সে এক অবস্থা, সে এক সময়। আর আজ অরুদ্রতীর কথার সীতা সঙ্গমে সূচীত রাহের অঙ্গস্পর্শ করিল, এ আর এক অবস্থা, এ আর এক সময়! অবস্থা ও সময়ের পার্থক্যের মধ্যে একটি ঐক্য ছিল, বাহ্যে সর্বত্রই সমান। অরুদ্রতী তখন গৌরজনকে লক্ষ্য করিয়া সীতাদেবীর গ্রহণ সম্বন্ধে তাহাদের মত জানিতে চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অলীক অপবাদ দেওয়ার জন্য তাহাদের তিরস্কারও করিলেন—তখন গৌরজনেরা লজ্জার অধোবদন রহিল। তাহাদের কর্ণে অরুদ্রতীর উচ্চারিত বাণী প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—

“গৌরজনগণ, গঙ্গা ও পৃথিবী বাহাকে পবিত্রা জানিয়া হাতে ধরিয়া আনিয়া দিলেন, অগ্নি বাহার পুণ্যচরিত্রের সাক্ষীস্বরূপ আছেন, সেই দেবজনসত্ত্বা স্বর্গ্যকুল-বধু সীতা আজ পরিগৃহীত হইবে—এ বিষয়ে তোমরা কি বলিতে চাও?”

গৌরজনেরা আর কি বলিবে? তাহারা আজ নিজেদের কৃতকার্বোর জন্য অহুতপ্ত। তাহারা আজ বার বার সীতাদেবীকে নমস্কার করিতে লাগিল। সর্বসম্মতিক্রমে সীতাদেবীর গ্রহণ সাব্যস্ত হইল।

দেবতারা পুশ্পবৃষ্টিবারা, কবিরা আশীর্বাদ বারা এই গ্রহণ ব্যাপারটিকে অভিনন্দিত করিল।

কুণ্ড লব জালিল, রাহচর্য তাহাদের পিতা, লক্ষ্মণ কনিষ্ঠভ্রাত, সীতাদেবী গর্ভধারিণী মাতা, রাজর্ষি জনক মাতামহ। বালকদের জন্মে আনন্দ আর ধরে না। মিলনের সুখাধেয়ে সকলেরই আশে তখন একটি অপ্রাণিল ভক্তি দেখা দিল।

## উত্তর চরিত

মিলনের নিবিড় আনন্দে উত্তর-রামচরিত নাটকটীও সার্থক হইয়া উঠিল। রামায়ণের এতবড় বিরোধান্ত ব্যাপারটিকে কবি এক নুতন দৃষ্টে ফুটাইলেন। এক নুতন ভাবধারা আনিয়া দিয়া অপূর্ণ প্রতিভার পরিচয় দিয়া গেলেন। সংস্কৃত নাটক বিরোধান্ত হইবার রীতি নাই বলিয়াই যে তিনি ইহাকে মিলনান্ত করিয়াছেন—ইহা বলিলে কবি-প্রতিভার অসম্মান করা হয়।

তিনি বুঝিয়াছিলেন, নীতার মত সাধবী ও পতিপ্রাণার মর্যাদিক বাতনা যদি না দূর হইল, মর্শ্বহলে দৃঢ়নিষ্ঠাত শল্য যদি না উন্মোচিত হইল, তবে পতিভক্তির ও অলৌকিক সত্যবোধের মধ্যমা কি রহিল? নীতার চকুজল শুকাইল না, রামের “পুটপাক-প্রতীকাশ” শোক দূর হইল না, ভবিষ্যতে—চির অনাখ্যাস আগিয়া থাকিল, পুণ্য ও স্বার্থভ্যাগের জর দেখান হইল না—তবে কি হইল? কাব্যে ইতিহাসে বাহা থাকে থাকুক, রসমঞ্চে ইহা চলিবে না; এই সকল ভাবিয়াই কবি তরুভূতি নাটকে রামনীতার মিলন-দেখানই ভাল বনে করিলেন। গর্ভনাটক দেখাইবার ছলে লক্ষণের মুখ দিয়া কবি তাঁহার এই কলসত ভাবনী প্রকাশও করিয়া গিয়াছেন।—“ভগবন্, এই কি আপনার কাব্যের উদ্দেশ্য” (প্রয়োজন, অর্থ) ?

রামনীতার মিলন কে না চাহে? অন্ততঃ নাটকে এ মিলন দেখিরা কে না তৃপ্ত হয়? সকলে (অন্ততঃ অনেকে) বাহা চাহে, কবি প্রতিনিধিক্রমে তাহাই চাহিয়াছেন মাত্র।

পরিণামে রামনীতার মিলন দেখাইতে হইবে বলিয়াই তৃতীর অঙ্কে দ্বারী-নীতার পরিকল্পনা। (তৃতীর অঙ্কে) রামের সেই করুণ স্বকল অবস্থা দেখিরা নীতার নিবিড় বিলাস-অনিত কঠিন হৃদয় কোমল হইয়াই আুইসে, “হিরণ্ময়ী নীতা অতিক্রান্তি দেখিরা রামসিদ্ধ আশ্রয় চকু,

অস্বাভাবিক করিয়া—স্বাভাবিক এই কথাতেই নীতার সজ্জাবসান-শলাট  
 প্রকাশিত হইয়া যায়—তাই নীতা স্নানকে পূর্ণ করিয়া বসিতে পারিয়া  
 ছিল—“অস্বাভাবিক হইল, অস্বাভাবিক।” শূন্যতা ও ভাগ্যবশী বারা এসতা  
 হইল, অস্বাভাবিকেরই কর্তৃক অভিনবিতা হইয়া নীতা এই অভিব্যক্তির বাধা  
 কুসিদ্ধি নিরা স্নানের পাশে সিরা বসিতে পারিয়াছিল।

সত্য-ভেদে উদ্বোধন নীতার আত্মসন্ধান অব্যবস্থার রাধিরা সত্যচরিত্রের  
 বৈশিষ্ট্য ও বহির্ভাষ্য বাক্য রাধিরা কবি যে ভাবে মিলনটী সম্পন্ন করিলেন,  
 সত্য সত্যচরিত্রের সৌন্দর্য এতটুকুও জান করিলেন না, তাহা যে তাঁর  
 স্নানেরই বিনী প্রতিভারই পরিচায়ক, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সম্পূর্ণ।















